2 – year B. Ed Programme

Part – I

Method Paper : Political Science

UNIVERSITY OF BURDWAN

DIRECTORATE OF DISTANCE EDUCATION

Golapbag, P.O – Rajbati,

Burdwan – 713104

পাঠ-প্রণেতা

ডঃ মিন্টু হালদার

অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর
শিক্ষা বিভাগ
মাইকেল মধুসূদন মেমোরিয়াল কলেজ
দুর্গাপুর, বর্ধমান।

যুগ্ম সম্পাদক

অধ্যাপক তুহিন কুমার সামন্ত

শিক্ষা বিভাগ
বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়।

ডঃ শাঁওলী চক্রবর্ত্তী

বিভাগীয় প্রধান (বি.এড)
ডিরেক্টরেট অফ ডিসট্যান্স এডুকেশন,
বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়।

গ্রন্থসত্ত্ব © ২০১৬

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়
বর্ধমান—৭১৩ ১০৪
পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।

প্রকাশনা

ডিরেক্টর, দূরশিক্ষা অধিকরণ
বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়।

প্রচ্ছদ ও মুদ্রণ

সরস্বতী প্রেস লিমিটেড
(পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগ)
কলকাতা - ৭০০ ০৫৬

সম্পাদকের নিবেদন

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে দূরশিক্ষা ব্যবস্থা কার্যকর করা হয়েছে ১৯৯৪ সাল থেকে। আর দূরশিক্ষার মাধ্যমে বি.এড. চালু করার পরিকল্পনাটি রূপায়িত হয়েছে ২০১৪ সালে, যা দূরশিক্ষা অধিকরণের তথা বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম বড় প্রাপ্তি। সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে এই প্রচেষ্টা এই প্রথম। ভারতের মতো জনবহুল ও উন্নয়নশীল দেশে শিক্ষক-শিক্ষিকার ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটানোর জন্য এবং এই পেশামূলক কোর্সটির বিস্তার ঘটানোর জন্য এই কার্যক্রমের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।

বি.এড. কোর্সটি NCTE-র (National Council For Teacher Education) নিয়মানুসারে দ্বি-বার্ষিক কোর্স হিসাবে কার্যকরী হয়েছে। Part-I ও Part-II-এর চারটি করে আবশ্যিক পেপার এবং সর্বমোট ১২টি মেথড পেপারের পাঠ্যবিষয়গুলি যাতে ছাত্রছাত্রীদের কাছে সহজবোধ্য হয় এবং অন্য কারও সাহায্য ছাড়াই যাতে তারা তা অনুধাবন করতে পারে, সেজন্য প্রতিটি পেপারের জন্য একটি পাঠ্যপুস্তক আবশ্যিক হয়ে পড়ে, যা কিনা সম্পূর্ণভাবে এখানকার পাঠক্রম অনুসারী। এই কাজটি সুসম্পন্ন করার জন্য দূরশিক্ষা অধিকরণ; বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাবিভাগ এবং অন্যান্য অনুমোদিত কলেজগুলি থেকে দক্ষ অধ্যাপক/অধ্যাপিকা নিযুক্ত করেন। তাঁরা প্রত্যেকেই যথাযোগ্য মর্যাদায় তাঁদের কাজটি সম্পন্ন করেছেন। তাঁদের প্রত্যেককে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই।

দূরশিক্ষা অধিকরণের অধিকর্তা ডঃ দেবকুমার পাঁজা মহাশয় এই কার্যক্রম সুচারুভাবে পরিচালনা করেছেন। উপ-অধিকর্তা শ্রী অংশুমান গোস্বামীর অকুণ্ঠ সহযোগিতার ফলেই কাজটি সংক্ষিপ্ত সময়ে সম্পন্ন করা সম্ভব হয়েছে। তাঁদের জানাই আমাদের কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ। তাঁদের উৎসাহ ও পরামর্শ প্রতি মুহূর্তে আমাদের প্রেরণা জুগিয়েছে।

দূরশিক্ষা অধিকরণের অন্যান্য সকল আধিকারিক ও কর্মীবৃন্দ এবং গ্রন্থাগার কর্মীদের ধন্যবাদ জানাই। মুদ্রণ প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার ও কর্মীদের সহযোগিতা অবশ্য-স্মরণীয় এবং সামগ্রিকভাবে সবক্ষেত্রে আমাদের পাশে থাকার জন্য ধন্যবাদ জানাই বি.এড.-এর দুইজন কোর-ফ্যাকাল্টি ডঃ সোমনাথ দাস এবং শ্রী অর্পণ দাসকে।

আগস্ট, ২০১৬

প্রফেসর তুহিন কুমার সামন্ত

ডঃ শাঁওলী চক্রবর্ত্তী

Contents :

একক - ১	: রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সংজ্ঞা, পরিধি এবং বিষয়বস্তু	১
একক - ২	: একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর বিষয়বস্তু শিক্ষাতাত্ত্বিক পাঠ বিশ্লেষণ	১৮
একক - ৩	: রাষ্ট্রবিজ্ঞান শিক্ষণের পদ্ধতি	৩৫
একক - ৪	: রাষ্ট্রবিজ্ঞানের শিখন পদ্ধতি	৫২
একক - ৫	: রাষ্ট্রবিজ্ঞান পাঠ্যপুস্তকের বৈশিষ্ট্য	৭১
একক - ৬	: শিক্ষাসহায়ক উপকরণ	৭৫
একক - ৭	: পাঠ পরিকল্পনা প্রস্তুত	৮৪

UNIT – 1

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সংজ্ঞা, পরিধি এবং বিষয়বস্তু

(Definition scope nd subject matter of Political Science)

এককের গঠন বিন্যাস (Structure)

১.১ উদ্দেশ্য

১.২ সূচনা

১.৩ রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সংজ্ঞা

- ১.৩.১ রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আধুনিক সংজ্ঞা
- ১.৩.২ গ্রহণযোগ্য সংজ্ঞা

১.৪ রাষ্ট্রবিজ্ঞানের পরিধি

১.৫ একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর বিষয়বস্তু

- ১.৫.১ রাষ্ট্রবিজ্ঞান কি বিজ্ঞান পদবাচ্য
- ১.৫.২ জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার
- ১.৫.৩ আইনের বিভিন্ন উৎস
- ১.৫.৪ গণতন্ত্র ও একনায়কতন্ত্রের পার্থক্য

১.৬ সারসংক্ষেপ

১.৭ গ্রন্থপঞ্জী

১.৮ প্রশ্নাবলী

১.১ উদ্দেশ্য (OBJECTIVE) :

এই এককটি পাঠ করে শিক্ষার্থীরা

- ★ রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সংজ্ঞা দিতে পারবেন।
- ★ রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আধুনিক সংজ্ঞাগুলি দিতে পারবেন।
- ★ রাষ্ট্রবিজ্ঞানের গ্রহণযোগ্য সংজ্ঞা দিতে পারবেন।
- ★ রাষ্ট্রবিজ্ঞানের পরিসর বর্ণনা করতে পারবেন।
- ★ রাষ্ট্রবিজ্ঞান কি বিজ্ঞান পদবাচ্য তা বিশ্লেষণ করতে পারবেন।
- ★ জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার সম্পর্কে বর্ণনা দিতে পারবেন।
- ★ আইনের বিভিন্ন উৎস ও তাদের গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারবেন।
- ★ গণতন্ত্র ও একনায়কতন্ত্রের মধ্যে পার্থক্য করতে পারবেন।

১.২ সূচনা (INTRODUCTION) :

১৭০১ সালে বিশপকে লেখা লিবনিজ (Leibniz)-এর একটি চিঠিতে 'রাষ্ট্রবিজ্ঞান' কথাটির প্রথমে প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। রাষ্ট্রবিজ্ঞানী হিউমের (১৭১১-১৭৭৬)পরবর্তী সময় থেকে 'রাষ্ট্রবিজ্ঞান' শব্দটি সাধারণভাবে প্রযুক্ত হতে থাকলেও সমাজ বিজ্ঞানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শাখা হিসাবে বর্তমানে যে অর্থে শব্দটিকে ব্যবহার করা হয়, ঊনিশ শতকের শেষভাগের পূর্ব পর্যন্ত সেই অর্থে তা ব্যবহৃত হত না। লিপসেট (Lipset) রচিত 'দ্য পলিটিক্যাল ম্যান' (The Political Man) থেকে জানা যায় যে, ১৮৯০ সালে 'আমেরিকান বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থতালিকা' (American University Catalogue)-তে 'রাষ্ট্রবিজ্ঞান' কথাটি আধুনিক অর্থে সর্বপ্রথম ব্যবহৃত হয়।

১.৩ রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সংজ্ঞা (Definition of Political Science) :

'রাষ্ট্রবিজ্ঞান'-এর সংজ্ঞার ক্ষেত্রে বিভিন্ন রাষ্ট্রবিজ্ঞানীর ভিন্ন মত লক্ষ্য করা যায়। কারণ বিভিন্ন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সংজ্ঞা দিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে মন্তব্য করতে গিয়েও ওয়াসবী (S.L.Washby) বলেছেন, রাষ্ট্রবিজ্ঞানের প্রকৃতি এবং পরিধি সম্পর্কে বিভ্রান্তি ও মত পার্থক্য থাকার ফলে কোন একটি সংজ্ঞাকে সঠিক বলে স্বীকৃতি দেওয়া যায় না। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সংজ্ঞার আলোচনায় অনেকেই 'রাষ্ট্র' ও 'বিজ্ঞান' শব্দ দুটিকে ব্যাখ্যা করে বলেছেন যে, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বলতে এমন একটি বিষয়কে বোঝায় যেখানে রাষ্ট্রের বিভিন্ন দিক নিয়ে বিজ্ঞানসম্মত অর্থাৎ যুক্তিনিষ্ঠ, তথ্যভিত্তিক এবং বস্তুনিষ্ঠ আলোচনা করা যয়। ব্লুন্ট্সলি, বার্জেস, লীকক, সিলি জেলিনিক, গার্নার, গেটেল, র‍্যাফল প্রমুখ রাষ্ট্রবিজ্ঞানীগণ রাষ্ট্রকে কেন্দ্র করেই রাষ্ট্রের সংজ্ঞা দিয়েছেন।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানী গেটেল (Gettell)-এর মতে ''রাষ্ট্রবিজ্ঞান হল রাষ্ট্র কি ছিল তার ঐতিহাসিক অনুসন্ধান, বর্তমান রাষ্ট্রের বিস্তৃত বিশ্লেষণ এবং ভবিষ্যৎ রাষ্ট্রের রূপ ও প্রকৃতি সম্পর্কে রাজনৈতিক ও নৈতিক আলোচনা''। অনুরূপভাবে গার্নার (Garner) বলেন, ''রাষ্ট্রবিজ্ঞান আলোচনার সূচনা ও সমাপ্তি রাষ্ট্রকে নিয়ে'' (Political Science begins and ends with the state)। ফরাসী দার্শনিক পল জানেঁ (Paul Janet) বলেছেন, ''সামাজিক বিজ্ঞানের যে শাখা রাষ্ট্রের ভিত্তি ও সরকার নিয়ে আলোচনা করে তাকে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বলে''। বার্জেস বলেছেন, ''রাষ্ট্রবিজ্ঞান হল স্বাধীনতা ও সার্বভৌমিকতার বিজ্ঞান''। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের এই রাষ্ট্রকেন্দ্রিক সংজ্ঞাকে সাধারণভাবে সনাতন বা সাবেকি সংজ্ঞা বলা হয়।

১.৩.১ রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আধুনিক সংজ্ঞা (Modern Definition of Political Science) :

বিংশ শতাব্দীর শুরু থেকে গ্রহাম ওয়ালাস (Graham Wallas), আর্থার বেন্টলি (Arthur Bentley), লাসওয়েল, অ্যালানবল, ডেভিড ইস্টন, রবসন প্রমুখ রাষ্ট্রবিজ্ঞানীগণ নতুন ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের নতুন ধরনের সংজ্ঞা দিতে শুরু করেন। তাঁদের মতে, রাষ্ট্রবিজ্ঞান কেবল রাষ্ট্রকে নিয়ে আলোচনা করে না, সেই সঙ্গে বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, রাজনৈতিক দল, কোনো গোষ্ঠী বা ব্যক্তির রাজনৈতিক আচার-আচরণ, চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী প্রভৃতি নিয়েও আলোচনা করে।

আধুনিক আলোচনায় রাষ্ট্রবিজ্ঞানীগণ রাষ্ট্রের পরিবর্তে মানুষের আচরণ, বিরোধ, ক্ষমতা, প্রভাব, রাজনৈতিক পরিবর্তন প্রভৃতির উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তাঁদের মতে রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে আরও বেশি বাস্তব সম্মত করে গড়ে তোলার জন্য কেবল রাষ্ট্র ও তার প্রতিষ্ঠানগুলির আলোচনায় যথেষ্ট নয়। কারণ এর মাধ্যমে রাজনৈতিক জীবনের পুরোপুরি পরিচয় পাওয়া যায় না। ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর আচরণ, রাজনৈতিক দল, বিশেষ বিশেষ স্বার্থরক্ষার জন্য গঠিত গোষ্ঠী, রাজনৈতিক প্রভাব ও শক্তি প্রভৃতি বিষয়কে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সংজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত করা উচিত।

অ্যালান বলের মতে ''রাষ্ট্রবিজ্ঞান হল সেই বিষয় যা সমাজস্থ মানুষের বিরোধ ও বিরোধের মীমাংসা নিয়ে আলোচনা করে''। ইস্টন (Easton)-এর মতে , ''রাষ্ট্রবিজ্ঞান হল মূল্যের কর্তৃত্বসম্পন্ন বরাদ্দের (authoritative allocation of values) পাঠ, কারণ তা ক্ষমতার বন্টন ও প্রয়োগের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়''। লাসওয়েলের মতে, ''সমাজের প্রভাব ও প্রভাবশালীদের সম্পর্কে আলোচনা ও বিশ্লেষণের নামই হল রাষ্ট্রবিজ্ঞান'' (Politics is the study of influence and the influential)।

আবার মার্কসবাদীরা রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে দেখেছেন ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে। তাঁদের মতে অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে উপেক্ষা করে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের কোন আলোচনা বিজ্ঞানসম্মত হতে পারে না। কারণ রাষ্ট্রবিজ্ঞান হল সমাজের উপরিকাঠামোর বিজ্ঞান। এর এই উপরিকাঠামো বিজ্ঞান এবং এই উপরিকাঠামোর মৌল চরিত্র নির্ধারণ হয় সমাজের প্রচলিত অর্থব্যবস্থার ভিত্তিতে।

১.৩.২ গ্রহণযোগ্য সংজ্ঞা :

পরিশেষে বলা যেতে পারে যে বিশ ও একুশ শতকে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক রাজনীতির গতি প্রকৃতির বিশেষ পরিবর্তন সাধিত হওয়ায় রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিষয়বস্তুর পরিধি ব্যাপকভাবে সম্প্রসারিত হয়েছে। এই নতুন রাজনৈতিক পরিস্থিতির দিকে দৃষ্টি রেখে আমরা রাষ্ট্রবিজ্ঞানের একটি সন্তোষজনক সংজ্ঞা নির্দেশ করতে

পারি। যথা- রাষ্ট্রবিজ্ঞান হল সমাজবিজ্ঞানের সেই শাখা, যা বিজ্ঞানভিত্তিক আলোচনার মাধ্যমে রাষ্ট্রের তত্ত্ব সংগঠন, শাসনপ্রণালী ও তার আন্তর্জাতিক সম্পর্কের বিশ্লেষণ, আন্তর্জাতিক আইন, সংগঠন ইত্যাদি সম্পর্কে এবং বিভিন্ন প্রকার রাজনৈতিক ব্যবস্থার তুলনামূলক আলোচনা ও মূল্যায়ন করে।

১.৪ রাষ্ট্রবিজ্ঞানের পরিধি

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের একটি গতিশীল বিদ্যা। স্বভাবতই সময় ও সমাজের পরিবর্তনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয় বারে বারে বদলেছে। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের জনক অ্যারিস্টটলের সময়ে সমাজ ও রাষ্ট্রের মধ্যে কোনো পার্থক্য ছিল না বলে সমাজের সব কিছুই ছিল রাষ্ট্রের এলাকাভুক্ত। ফলে অ্যারিস্টটলের হতে যে রাষ্ট্রবিজ্ঞান গড়ে ওঠে তা শুধু রাষ্ট্রসম্পর্কিত বিদ্যাই ছিল না, তা ছিল সর্বোচ্চ বিদ্যা (Master Science) যার অন্তর্ভুক্ত ছিল যাবতীয় সমাজিক বিষয় ও সমস্যা। এর দীর্ঘকাল পরে ইউরোপে আধুনিক যুগ শুরু হলে সমাজ রাষ্ট্র থেকে আলাদা হয়ে যায়। স্বভাবতই এই পর্বে প্রথমে রাষ্ট্র রাষ্ট্রবিজ্ঞানের প্রধান আলোচ্য বিষয় হয়। পরে রাষ্ট্র ব্যবস্থা পরিণত হয়ে উঠলে রাষ্ট্রের পাশাপাশি সরকার ও সমগ্র শাসনব্যবস্থা এবং সেই সুবাদে রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য পূরণে কর্মরত নানা ধরনের রাজনৈতিক সংগঠনও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনায় স্থান পায়। আরও পরে তুলনামূলক রাজনীতি ও শাসনব্যবস্থাকে কেন্দ্র করে আলোচনা শুরু হয় এবং ঊনিশ শতক থেকে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও রাজনীতি এবং আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক সংগঠন রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনা বিষয় হয়ে ওঠে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর পর্বে রাজনৈতিক প্রক্রিয়া ও সামাজিক মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়। এর ফলে আধুকি রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনার বিষয় হয়ে ওঠে। সমাজ সম্পর্কে অতি-উৎসাহী রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা রাষ্ট্রকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয় হিসাবে কার্যত বাতিল করেন।

এইসব কিছু নিয়ে অবশ্য অনেক বিরোধ-বিতর্ক হয়েছে। তবে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনার পরিধি স্থির করতে হলে সব রকমের বিরোধ-বিতর্ক সরিয়ে রাখা দরকার। সম্পূর্ণ নিরপেক্ষভাবে এবং বাস্তব পরিস্থিতি বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত। এইভাবে দেখলে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনার পরিধি হয় এইরকম ঃ-

(১) পদ্ধতিগত বিষয় : রাষ্ট্রবিজ্ঞানের যা কিছু আলোচনা তা কোন পরিপ্রেক্ষিতে, কী ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে এবং কোন পদ্ধতি প্রয়োগ করে করা হবে আলোচনার শুরুতেই এইসব প্রশ্নের মীমাংসা করা প্রয়োজন। তাই আলোচনার পদ্ধতি বিষয় রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অন্যতম আলোচ্য বিষয়।

(২) রাষ্ট্র এবং রাষ্ট্র ও ব্যক্তির সম্পর্ক : কার্যক্ষেত্রে দেখা যায় যে, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক রাজনীতির কেন্দ্রবিন্দু এখনো পর্যন্ত রাষ্ট্র আর এই রাষ্ট্র সম্পর্কে সমস্ত কৌতুহল ও জিজ্ঞাসা মেটানোর দায়িত্ব কেবল রাষ্ট্রবিজ্ঞানেরই। কাজেই রাষ্ট্রের উৎপত্তি, প্রকৃতি, উদ্দেশ্য ও কার্যাবলী এবং ব্যক্তির সঙ্গে তার সম্পর্ক রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অন্যতম প্রধান্য আলোচ্য বিষয়।

(৩) ক্ষমতা : রাষ্ট্র নিঃসন্দেহের সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী। তবে রাষ্ট্রই একমাত্র ক্ষমতাধর নয়। সমাজে ছড়িয়ে আছে অসংখ্য ক্ষমতাকেন্দ্র। রাষ্ট্র যেভাবে ক্ষমতা অর্জন করে এইসব ক্ষমতাকেন্দ্রেও সেইভাবে ক্ষমতা অর্জন করা হয়। আবার রাষ্ট্র তার ক্ষমতার বৈধতা আদায় করে যেভাবে এই ক্ষমতাকে কর্তৃত্ব (authority)-এ রূপান্তরিত করে ঠিক একই কৌশল অন্যান্য ক্ষমতাকেন্দ্রেও প্রয়োগ করা হয়। কাজেই সমাজ ও রাষ্ট্রের পটভূমিতে

ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের স্বরূপ ও গড়ন এবং ক্ষমতার প্রয়োগ রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অন্যতম আলোচ্য বিষয়। এছাড়া সমাজের ক্ষমাকেন্দ্রগুলির মধ্যে কীভাবে ক্ষমতার বন্টন হয় সেই বিষয়টিও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনার অন্তর্ভুক্ত।

(৪) শাসনব্যবস্থার প্রাতিষ্ঠানিক ও আচরণবাদী বিশ্লেষণ : রাষ্ট্রের অস্তিত্ব তার শাসনব্যবস্থার মধ্য দিয়ে অনুভব করা যায়। শাসন, আইন ও বিচার সংক্রান্ত তিনটি স্বতন্ত্র শাখার সহায়তার এই শাসনব্যবস্থা পরিচালিত হয়। এইসব শাখাকে কেন্দ্র করে যে কর্মপ্রক্রিয়া চলতে থাকে তা পুরোপুরি বুঝতে হলে শুধু এ বিষয়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলি বিশ্লেষণ করাই যথেষ্ট নয়, একই সঙ্গে প্রতিষ্ঠানে কর্মরত ব্যক্তিদের দৃষ্টিভঙ্গি ও আচরণও খতিয়ে দেখা দরকার। তাই রাষ্ট্রের শাসন, আইন ও বিচার সংক্রান্ত প্রক্রিয়ার প্রাতিষ্ঠানিক ও আচরণবাদী বিশ্লেষণ রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনার পরিধির অন্যতম অংশ।

(৫) রাজনৈতিক সংস্কৃতি ও রাজনৈতিক সমাজিকীকরণ : আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে রাজনীতি ও রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের সুবাদে জনসাধারণের মধ্যে রাজনীতি ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা সম্পর্কে স্বতঃস্ফূর্তভাবে কতকগুলি ধ্যানধারণা গড়ে ওঠে। একে বলে রাজনৈতিক সংস্কৃতি (Political culture)। এই রাজনৈতিক সংস্কৃতি যদি অনুকূল হয় তাহলে রাষ্ট্র সহজেই তার কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে পারে। আবার কতকগুলি প্রতিষ্ঠানের সহায়তায় যখন এই রাজনৈতিক সংস্কৃতি এক প্রজন্মের কাছ থেকে আর এক প্রজন্মের কাছে পৌঁছায় তখন তাকে বলে রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ (Political Socialisation)। এই রাজনৈতিক সামাজিকীকরণের সাহায্যেই রাজনৈতিক সংস্কৃতি স্থায়িত্ব লাভ করে। সঙ্গত কারণেই তাই রাজনৈতিক সংস্কৃতি ও রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ রাষ্ট্রবিজ্ঞানের এক গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য বিষয়।

(৬) রাজনৈতিক অংশগ্রহণ, জনমত ভোটাচরণ এবং রাজনৈতিক দল ও স্বার্থগোষ্ঠী :

আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র নাগরিকদের রাজনৈতিক অংশগ্রহণ (Political participation)-এর সুযোগ দেয়, জনমত গঠনকে উৎসাহিত করে এবং অবাধ রাজনৈতিক প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করে। রাজনৈতিক প্রতিযোগিতার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত থাকে রাজনৈতিক দলগুলি আর তাতে পরোক্ষভাবে সমাজের বিভিন্ন স্বার্থগোষ্ঠী (Interest Group) উৎসাহ জোগায়। অন্যদিকে রাজনৈতিক প্রতিযোগিতার সুবাদে জনগণ তাদের পছন্দমতো ভোট দেয় এবং এইভাবে তাদের ভোটাচরণ (Voting Behaviour)-এর পরিচয় পাওয়া যায়। এইজন্যই রাজনৈতিক অংশগ্রহণ ও জনমত, রাজনৈতিক প্রতিযোগিতার ধরন এবং রাজনৈতিক দল ও স্বার্থগোষ্ঠীর কার্যকলাপ রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়।

(৭) তুলনামূলক রাজনীতি ও শাসনব্যবস্থা : এক দেশের রাজনীতি ও শাসনব্যবস্থার সঙ্গে অন্যান্য দেশের রাজনীতি ও শাসনব্যবস্থার তুলনামূলক আলোচনা সেই দেশের রাজনীতি ও শাসনব্যবস্থার উন্নয়ন সম্পর্কে পথের হদিস দিতে পারে। তাই তুলনামূলক রাজনীতি ও শাসনব্যবস্থা দীর্ঘকাল ধরে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের এক গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য বিষয় হিসাবে স্বীকৃত।

(৮) রাজনৈতিক উন্নয়ন ও রাজনীতির অর্থনৈতিক ভিত্তি : বিশ শতকের দ্বিতীয় ভাগে পৃথিবীর বহু দেশে ও ঔপনিবেশিক শাসন থেকে মুক্ত হয়ে স্বাধীন রাষ্ট্র গঠন করে। এরাই উন্নয়নশীল দেশ নামে পরিচিতি। কতকটা অপ্রস্তুত অবস্থায় এবং উপযুক্ত আধুনিকীকরণ ছাড়াই তারা স্বাধীনতা পেয়েছিল বলে পরিণত সমাজ, রাষ্ট্র ও জাতিগঠন তাদের কাছে প্রধান সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। এই সমস্যার সংক্ষিপ্ত নাম রাজনৈতিক উন্নয়ন

(Political Development)। স্বভাবতই উন্নয়নশীল দেশগুলির রাজনীতির এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এই রাজনৈতিক উন্নয়ন। তবে রাজনৈতিক উন্নয়নের সঙ্গে অর্থনৈতিক উন্নয়নও অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। তাই রাজনীতির অর্থনৈতিক বুনিয়াদ এবং রাজনৈতিক উন্নয়ন নিঃসন্দেহের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অন্যতম আলোচ্য বিষয়।

(৯) বিশ্বায়ন : একুশ শতকে যে বিশ্বায়ন (Globalisation)-এর ঢেউ উঠেছে কোন দেশের অভ্যন্তরীণ রাজনীতি ও শাসনব্যবস্থাই তার প্রভাব এড়িয়ে যেতে পারে না। বস্তুত, আজকের দিনে একটি রাষ্ট্রকে অনেক ক্ষেত্রেই বিশ্বায়নের আদর্শের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে তার রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত নিতে হয়। এই কারণে আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনায় বিশ্বায়ন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

(১০)আন্তর্জাতিক রাজনীতি ও সংগঠন : আজকের দিনে কোন রাষ্ট্রই আন্তর্জাতিক রাজনীতি সম্পর্কে উদাসীন হয়ে থাকতে পারে না। একই সঙ্গে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ (United Nations)-এর মতো আন্তর্জাতিক সংগঠনের প্রতি তার অঙ্গীকারও অস্বীকার করতে পারে না। কাজেই রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনায় আন্তর্জাতিক রাজনীতি ও সংগঠনের এক বিশেষ স্থান রয়েছে।

১.৫ একাদশ (XI) ও দ্বাদশ (XII) শ্রেণীর পাঠ্যসূচীর বিষয়বস্তু থেকে কিছু নমুনা প্রশ্ন ও উত্তর এখানে আলোচনা করা হল -

১.৫.১ রাষ্ট্রবিজ্ঞান কি বিজ্ঞান পদবাচ্য ?

রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে বিজ্ঞান বলা যায় কিনা এ নিয়ে বিতর্ক দীর্ঘ দিনের। এ ব্যাপারে দুটি পরস্পর বিরোধী চিন্তাধারা লক্ষ্য করা যায় - একটির মতে রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে বিজ্ঞান বলা যায় না, অপরটির মতে রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে বিজ্ঞান বলা যায়। প্রথমে দলের মধ্যে আছেন বাক্‌লে (Buckle), কোঁত (Comte), মেট্‌ল্যান্ড (Maitland) প্রমুখ রাষ্ট্রবিজ্ঞানী। আর দ্বিতীয় দলের মধ্যে আছেন অ্যারিস্টটল, বোদাঁ, মন্তেস্কু, হব্‌স, লর্ড ব্রাইস, ব্লুন্টস্‌লি, পোলক প্রমুখ রাষ্ট বিজ্ঞানী।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে বিজ্ঞান না বলার যুক্তি :

রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে যাঁরা বিজ্ঞান বলার পক্ষপাতী নন, তাঁরা নিম্নলিখিত যুক্তির অবতারণা করেছেন :

(১) রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু ব্যাপক, জটিল, পরিবর্তশীল এবং অনিশ্চয়তারপূর্ণ। তাই পদার্থবিদ্যা ও রসায়নবিদ্যার ন্যায় রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিষয়বস্তুকে পর্যবেক্ষণ, বিশ্লেষণ বা শ্রেণীবিভাগ করা যায় না।

(২) রাষ্ট্রবিজ্ঞানের কোন নির্দিষ্ট আলোচনা-পদ্ধতি নেই। রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের পর্যবেক্ষণমূলক, পরীক্ষামূলক, তুলনামূলক, সমাজ বিদ্যামূলক, ঐতিহাসিক, দার্শনিক ইত্যাদি নানা পদ্ধতি অনুসরণ করতে দেখা যায়। বিশুদ্ধ বিজ্ঞানে এরূপ বিভিন্ন পদ্ধতিক প্রয়োগ ঘটে না।

(৩) রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু সতত পরিবর্তনশীল। যার ফলে একই ঘটনাকে বারবার পরীক্ষা করে দেখা যায় না। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের মূল বিষয়বস্তু হল মানুষের রাজনৈতিক জীবন ও রাষ্ট্রের সমস্যাবলী। এগুলিকে অপরিবর্তিত রাখা যায় না। তাছাড়া যে মানুষকে নিয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনা, সেই মানুষ সব সময় একই রকম আচরণ করে না। তাই ভৌত বিজ্ঞানের ন্যায় রাষ্ট্রবিজ্ঞানে সাধারণ সূত্র আবিষ্কার করা অসম্ভব।

(৪) ভৌত বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বিজ্ঞানীরা গবেষণাগারে প্রয়োজনীয় পরিবেশ সৃষ্টি করে পরীক্ষা নিরীক্ষা চালান। কিন্তু রাষ্ট্রবিজ্ঞানীর পক্ষে সেরূপ করা সম্ভব নয়। ইচ্ছা, আবেগ ও অনুভূতিসম্পন্ন মানুষকে নিয়ে তাকে কাজ করতে হয়। পরীক্ষা বা পর্যবেক্ষণের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত জনমত তথা পারিপার্শ্বিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটবে না একথা মনে করা ভুল। তাই কোন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী প্রকৃতি বিজ্ঞানীর ন্যায় ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারেন না।

(৫) প্রাকৃতিক বিজ্ঞানীরা আলোচনা সম্পূর্ণভাবে মূল্য-নিরপেক্ষ হয়। তাঁর আলোচনায় ভাল-মন্দ, উচিত-অনুচিতের কোন প্রশ্ন থাকে না। কিন্তু রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে কোনটা ভাল, কোনটা মন্দ-এই প্রশ্ন এসে যায়। রাষ্ট্রবিজ্ঞানীর গবেষণার ওপর তাঁর নিজস্ব চিন্তা-ভাবনা ও মূল্যবোধের প্রভাব পড়ে। তাই রাষ্ট্রবিজ্ঞানে প্রকৃতি বিজ্ঞানের মত বিষয়নিষ্ঠতা (objectivity) থাকে না।

(৬) বস্তুজগতের যে কোন উপাদান বা তার অণু-পরমাণুকে নিয়ে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে গবেষণা বা বিচার-বিশ্লেষণ চলে। কিন্তু একজন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ব্যক্তি মানুষকে নিয়ে কোন অনুসন্ধান চালাতে পারেন না। তিনি শুধু সমাজবদ্ধ মানুষ সম্পর্কে সামগ্রিক আলোচনা চালাতে পারেন।

(৭) রাষ্ট্রবিজ্ঞানী কোঁত (Comte)-এ মতে, রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে বিজ্ঞানের মর্যাদা দেওয়া যায় না, কারণ (ক) রাষ্ট্রনীতির আলোচনা পদ্ধতি, নীতি ও উপসংহার সম্পর্কে ঐক্যমত্যের অভাব আছে, (খ) অগ্রগতির ক্ষেত্রে ধারাবাহিকতার অভাব আছে এবং (গ) বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রে সুস্পষ্টতার অভাব আছে।

উপরোক্ত কারণে অনেকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে বিজ্ঞান বলে মেনে নিতে নারাজ। মেটল্যান্ড (Maitland) একবার বলেছিলেন, ''যখন আমি কোন পরীক্ষায় এমন প্রশ্নপত্র দেখি যার শিরোনাম রাষ্ট্রবিজ্ঞান, তখন আমার দুঃখ হয় শিরোনামটির জন্য, প্রশ্নগুলির জন্য নয়'' বাক্‌ল বলেন, বর্তমান অবস্থায় রাষ্ট্রবিজ্ঞান বলা তো চলেই না, এমনকি কলাশাস্ত্রের মধ্যেও এটি অনুন্নত। কেউ আবার এমন কথাও বলেছেন যে, রাষ্ট্রবিজ্ঞান যদি বিজ্ঞানের মর্যাদা লাভ করে, তাহলে চৌর্যবৃত্তিও কারিগরি জ্ঞানের পর্যায়ভুক্ত হতে পারে। (If politics is a science then burglary should be called technology)। লর্ড ব্রাইস রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে আবহ বিজ্ঞানের (Meteorology) পর্যায়ভুক্ত করেছেন। ঝড়-বৃষ্টি সম্পর্কে আবহবিদদের ভবিষ্যদ্বাণী যেমন নির্ভুল নয়, রাষ্ট্রবিজ্ঞানীর সিদ্ধান্তও তেমনি অভ্রান্ত নয়।

রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিজ্ঞান পদবাচ্য :

রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে বিজ্ঞান না বলার পক্ষে যেসব যুক্তি খাড়া করা হয়েছে, সেগুলি কোন কোন ক্ষেত্রে সত্য হলেও সর্বাংশে সত্য নয়। রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিজ্ঞান কিনা - এ প্রশ্নের সঠিক উত্তর পেতে গেলে আগে বিজ্ঞান বলতে ঠিক কি বোঝায় তা জানা দরকার। বিজ্ঞান হল জগৎ ও জীবন সম্পর্কিত বিশেষীকৃত জ্ঞান; সে জ্ঞান পর্যবেক্ষণ, পরীক্ষণ, বিশ্লেষণ ও অভিজ্ঞতালব্ধ হবে এবং তা সুসংহত, সুশৃঙ্খলিত ও কার্যকারণসূত্রে গ্রথিত হবে। এদিক থেকে বিচার করলে রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে অতি অবশ্যই বিজ্ঞান বলা যায়। কারণ ঃ

প্রথমত, অন্যান্য বিজ্ঞানের ন্যায় রাষ্ট্রবিজ্ঞানেও পর্যবেক্ষণ, অভিজ্ঞতা, শ্রেণীবিভক্তিকরণ ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে কোন বিষয় সম্পর্কে সুশৃঙ্খল জ্ঞান অর্জন করা সম্ভব, এর থেকে সাধারণ সূত্র নির্ধারণ করা সম্ভব এবং রাজনৈতিক সমস্যার সমাধানে তা প্রয়োগ করা সম্ভব। অধ্যাপক গেটেল (Gettell) বলেছেন, বিজ্ঞান বলতে যদি কোন বিষয় সম্পর্কে সুসংবদ্ধ পর্যবেক্ষণ ও অভিজ্ঞতার মাধ্যমে লব্ধ সম্যক জ্ঞান, আলোচনা, বিশ্লেষণ ও

শ্রেণী-বিভক্তিকরণ বোঝায়, তাহলে রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে খুব সঙ্গতভাবেই বিজ্ঞান বলে দাবি করা যায়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ফরাসী রাষ্ট্রবিজ্ঞানী মন্তেস্কু বিভিন্ন দেশের শাসনব্যবস্থা পর্যবেক্ষণ করে বিপুল অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে যে ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতিটি আবিষ্কার করেন, সেটি স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের ক্ষেত্রে আজও যথেষ্ট তাৎপর্যবহ। এশিয়া ও আফ্রিকার দেশগুলিতে সামরিক অভ্যুত্থানের ঘটনা বিশ্লেষণ করলে এরূপ একটি সাধারণ সূত্র নির্ণয় করা মোটেই কঠিন হবে না যে, আর্থিক অনুমতি, রাজনৈতিক চেতনার অভাব, জাতীয় অনৈক্য প্রভৃতি অবস্থা একনায়কতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার পক্ষে অনুকূল।

দ্বিতীয়ত, স্বাধীন ইচ্ছা শক্তিসম্পন্ন মানুষের রাজনৈতিক আচরণ জটিল হলেও তার মধ্যে বিশেষ সামঞ্জস্য পরিলক্ষিত হয়। আর এই সামঞ্জস্যপূর্ণ আচরণের ওপর ভিত্তি করে কতকগুলি সাধারণ সূত্র বা নিয়ম নির্ধারণ করা যায়। বিভিন্ন দেশের আমলাতন্ত্রের গতি-প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ করলে এ সম্পর্কে যে সাধারণ সূত্রগুলি পাওয়া যায় তা প্রশাসনিক সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে কাজে লাগানো যেতে পারে।

তৃতীয়ত, আধুনিক কালের আচরণবাদী রাষ্ট্রবিজ্ঞানীগণ গণিত ও পরিসংখ্যানের ব্যাপক প্রয়োগ ঘটিয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনাকে যথেষ্ট বিজ্ঞানসম্মত, মূল্য-নিরপেক্ষ এবং বস্তুনিষ্ঠ করে তুলেছেন। তাঁরা ঐতিহ্যবাহী রাষ্ট্রনৈতিক আলোচনার প্রতিষ্ঠানকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গী পরিত্যাগ করে ব্যক্তির আচার-আচরণ, রাজনৈতিক সংস্কৃতি প্রভৃতি সম্পর্কে ব্যাপক অভিজ্ঞতাবাদী তত্ত্ব গড়ে তোলার চেষ্টা করেছেন। বৈজ্ঞানিক কলাকৌশলের সার্থক প্রয়োগ ঘটিয়ে প্রণয় রায় কর্তৃক ভারতের নির্বাচনী আচার-আচরণের সঠিক বিশ্লেষণ এ ব্যাপারে একটি দৃষ্টান্ত হিসাবে উল্লেখ করা যেতে পারে।

উপসংহার : উপরোক্ত কারণে রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে বিজ্ঞান পদবাচ্য বলে মনে করা হলেও, রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে পদার্থবিদ্যা বা রসায়নবিদ্যার সমজাতীয় বিজ্ঞান বলে দাবি করা যায় না। উভয় বিজ্ঞানের পর্যালোচনা পদ্ধতি, লক্ষ্য ও বিষয়বস্তুর মধ্যে পার্থক্য আছে। যে মানুষ ও সমাজকে নিয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনা, সেই মানুষ ও সমাজকে নিয়ে সবরকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালানো যায় না, বা তা কাম্যও নয়। রাষ্ট্রবিজ্ঞানীকে তাই অনেক সময় অনুমানের ওপর নির্ভর করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয়। সেই সিদ্ধান্তগুলি যে অভ্রান্ত হবে এমন কোন কথা নেই। তবে একথা সত্য যে রাষ্ট্র বিজ্ঞানীদের অভিজ্ঞতা ক্রমশই প্রসারিত হচ্ছে এবং মানুষের আচার-আচরণ বিশ্লেষণে তাঁরা ক্রমেই দক্ষ হয়ে উঠেছেন। এই কারণেই লর্ড ব্রাইস রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে প্রগতিশীল বিজ্ঞান (Progressive Science) বলে অভিহিত করেছেন। সুতরাং রাষ্ট্রবিজ্ঞান সম্পূর্ণ বিজ্ঞানের মর্যাদার প্রতিষ্ঠিত না হলেও একটি পরিপূর্ণ বিজ্ঞানের দিকেই অগ্রসর হচ্ছে (A science in the making) বলা যায়।

১.৫.২ জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার বলতে কি বোঝ? এই নীতির সপক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তি দেখাও (What do you understand by the Right of self-determination of Nations? Argue for and against this principle)

অথবা

"এক জাতি এক রাষ্ট্র" - এই তত্ত্বটি পর্যালোচনা কর। (Discuss the Theory of "One nation one state").

প্রত্যেক জাতির স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গঠন করার অধিকারকে আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার বলা হয়। আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার তত্ত্বটি গড়ে উঠেছে 'এক জাতি এক রাষ্ট্র' নীতিকে কেন্দ্র করে। এই নীতি অনুযায়ী প্রত্যেক আত্মসচেতন জাতিই তার নিজস্ব সত্তা ও বৈশিষ্ট্য রক্ষা করতে চায় এবং সেই কারণে প্রত্যেক জাতির জন্য পৃথক রাষ্ট্র থাকা আবশ্যক। অর্থাৎ এই নীতি অনুসারে বহুজাতিক রাষ্ট্রের পরিবর্তে একজাতিক রাষ্ট্র গঠিত হওয়া উচিত। এই নীতির মূল কথা হল এই যে একমাত্র সার্বভৌম রাষ্ট্রের মাধ্যমেই একটি জাতীয় জনসমাজ শক্তিশালী ও মহিমান্বিত হয়ে উঠতে পারে।

১৭৭২ সালে তারা পোল্যান্ড দ্বিখণ্ডিত হবার সময় থেকে জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার তত্ত্বটি নিয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা আলোচনা শুরু করেন এবং বাস্তব রাজনীতিতেও এই ধারণাটি সক্রিয় শক্তিরূপে আত্মপ্রকাশ করে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে 'এক জাতি এক রাষ্ট্র' নীতিটি বলিষ্ঠ আন্দোলনের রূপ পরিগ্রহ করে। ১৮১৫ সালে ভিয়েনা কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হবার পর সমগ্র ইউরোপে এই নীতিটি সমর্থিত হয়। এই নীতির ভিত্তিতেই ইতালি, জার্মানি, গ্রীস, বেলজিয়াম প্রভৃতি জাতীয় রাষ্ট্রগুলির উদ্ভব ঘটে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবি পৃথিবীর সর্বত্রই জোরালো হয়ে ওঠে এবং আন্তর্জাতিক রাজনীতিকে আলোড়িত করে তোলে।

যেসব রাষ্ট্রবিজ্ঞানী এবং রাষ্ট্রনেতা আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার তত্ত্বটিকে জনপ্রিয় করে তোলেন, তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন জন স্টুয়ার্ট মিল, উড্রো উইলসন, ম্যাকইভার, বার্ণস, লেনিন, স্তালিন, বার্ট্রান্ড রাসেল প্রমুখেরা। মিল তাঁর Representative Government (১৮৬১) গ্রন্থে এই নীতিটির সমর্থনে বলেন, জাতীয় জনসমাজের সীমারেখা সরকারের সীমারেখার সমানুপাতিক হওয়া প্রয়োজন (The boundaries of Goverment should coincide with those of nationality)। ভূতপূর্ব মার্কিন রাষ্ট্রপতি উড্রো উইলসন 'এক জাতি এক রাষ্ট্র' নীতিটিকে বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয় উপাদান বলে মন্তব্য করেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর উইলসন প্রচারিত চৌদ্দ দফা শান্তি প্রস্তাবের মধ্যে একটিতে জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের উল্লেখ ছিল।

১৯০৩ সালের রাশিয়ার বলশেভিক পার্টির কর্মসূচীতে জাতিনির্বিশেষে আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের নীতি ঘোষিত হয়েছিল। ১৯১৭ সালে রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠনের অনতিকাল পরেই লেনিন-জার-শাসিত রাশিয়ার অত্যাচারিত জাতিসমূহের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার দানের কথা ঘোষণা করেন।

❐ আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের পক্ষে যুক্তি :

জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের সপক্ষে নিম্নলিখিত যুক্তিগুলি দেখান হয় :

(১) প্রত্যেক জাতিরই নিজস্ব সংস্কৃতি, জীবনবোধ, ঐতিহ্য, প্রতিভা থাকে। এক জাতি নিয়ে গঠিত রাষ্ট্রে এই সব জাতীয় গুণাবলীর বিকাশ ঘটার সুযোগ থাকে। বহু জাতি সমন্বিত রাষ্ট্রে শক্তিশালী জাতিসমূহের প্রাধান্যের ফলে সংখ্যলঘু ও দুর্বল জাতিসমূহের জাতীয় গুণাবলী উপেক্ষিত হয়।

(২) জনতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা ও বিকাশের ক্ষেত্রেও জাতিভিত্তিক রাষ্ট্র গঠনের নীতিটি বিশেষ উপযোগী। জাতিভিত্তিক রাষ্ট্রে একটিমাত্র জাতি বাস করে বলে সেই জাতের সকলে নিজেদের সরকার গঠনের সুযোগ পায়। কিন্তু বহুজাতি সম্বলিত রাষ্ট্রে সংখ্যলঘু জাতিগুলি সরকার গঠন ও পরিচালনার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়। এইভাবে তারা গণতান্ত্রিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়।

(৩) প্রত্যেক রাষ্ট্র একটিমাত্র জাতি নিয়ে গঠিত হলে আভ্যন্তরীণ গোলযোগ বা বিবাদের সম্ভাবনা কম থাকে। অপরপক্ষে বিভিন্ন জনগোষ্ঠী একসঙ্গে বসবাস করলে তাদের মধ্যে বিবাদ ও সংঘর্ষ লেগেই থাকে। ফলে রাষ্ট্রের ভিত্তি দুর্বল হয়ে পড়ে।

(৪) জাতিভিত্তিক রাষ্ট্রে পারস্পরিক সংঘর্ষ বা বিবাদ না থাকায় জনগণ যেভাবে দেশকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসতে পারে, বহু জাতিভিত্তিক রাষ্ট্রে কোন জাতিই সেভাবে দেশকে নিজের বলে বাবতে পারে না। দেশের বিপদে তারা নিজ নিজ স্বার্থরক্ষায় মগ্ন থাকে।

(৫) নৈতিকতার দিক থেকেও এই নীতিটি সমর্থনযোগ্য। শক্তিশালী জাতি দুর্বল জাতির ওপর অত্যাচার চালাবে, ন্যায়ের দিক থেকে তা সমর্থন কার যায় না। কিন্তু বহুজাতি সমন্বিত রাষ্ট্রে এটাই ঘটে থাকে। বহুজাতিভিত্তিক রাষ্ট্রে দুর্বল জাতিগুলিকে সবল জাতির নিয়ন্ত্রণাধীনে থাকতে বাধ্য করা হয়। ওই প্রসঙ্গে বাট্রান্ড রাসেলের একটি উক্তি স্মরণ করা যেতে পারে। তিনি বলেন, ''কোন জাতীয় জনসমাজকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে ভিন্ন জাতি দ্বারা গঠিত একটি সরকারের অধীনে থাকতে বাধ্য করা, আর কোন নারীকে, সে ঘৃণা করে এমন পুরুষকে বিয়ে করতে বাধ্য করা - এই ব্যাপার''।

(৬) 'এক জাতি এক রাষ্ট্র নীতি'. প্রতিষ্ঠিত হলে সংখ্যালঘু দুর্বল জাতিগুলির ওপর সবল জাতিগুলির অত্যাচার ও শোষণের পথ বন্ধ হয়ে যাবে। লেনিনের মতে জাতিসমূহের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার বলতে অত্যাচারী জাতির বন্ধন থেকে অবাধ রাজনৈতিক পৃথকীকরণের অধিকারকেই বোঝায়। লেনিন, স্তালিন প্রমুখ মার্কসবাদীরা জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারকে বিশ্বব্যাপী ধনতন্ত্রের বিরুদ্ধে শ্রমিক শ্রেণীর সংগ্রামের সহায়ক হিসাবে দেখেছেন।

(৭) মার্কিন রাষ্ট্রপতি উড্রো উইলসন 'এক জাতি এক রাষ্ট্র' নীতিকে বলিষ্ঠভাবে সমর্থন করেছেন এই যুক্তিতে যে, প্রত্যেক জাতিকে আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার দিলে পৃথিবী থেকে যুদ্ধের বিষাক্ত আবহাওয়া চিরকালের মত দূর করা যাবে।

❐ আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের বিপক্ষে যুক্তি :

আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের নীতিটিকে বিভিন্ন দিক থেকে সমালোচনা করা হয়ে থাকে। সমালোচনাগুলি হল নিম্নরূপ :

(১) প্রতিটি জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারকে স্বীকার করতে হলে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে হবে। এই নীতিকে কার্যকর করতে হলে গ্রেট ব্রিটেনকে চারটি রাষ্ট্রে, সুইজারল্যান্ডকে তিনটি রাষ্ট্রে, ভারতবর্ষকে অন্তত চল্লিশটি রাষ্ট্রে বিভক্ত করতে হবে। বস্তুত এই নীতি একবার স্বীকৃত হলে বড় রাষ্ট্র ভাঙতে ভাঙতে এমন জায়গায় পৌঁছাবে যার পরিণতি ভয়ঙ্কর হতে বাধ্য।

(২) জাতিভিত্তিক রাষ্ট্র গঠনের দাবি স্বীকৃত হলে যে অসংখ্য ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের সৃষ্টি হবে, সেগুলি শুধু আয়তনের দিক থেকে ক্ষুদ্র হবে তাই নয়, অর্থনৈতিক দিক থেকেও দুর্বল হবে। তাছাড়া আত্মরক্ষার জন্য তারা যথেষ্ট শক্তিশালী হতে পারবে না। ফলে এই সব রাষ্ট্র বৃহৎ ও শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলির তাঁবেদারে পরিণত হবে।

(৩) জাতিভিত্তিক রাষ্ট্র গঠিত হলেই যে জাতিগত বিরোধ ও সংঘর্ষ কমবে এমন কোন কথা নেই। হিন্দু ও মুসলমান এই দুই জাতির ভিত্তিতে ১৯৪৮ সালে ভারতকে দ্বিখণ্ডিত করা হলেও সমস্যা মেটেনি। উভয় দেশেই উভয় জনগোষ্ঠীর লোক থেকে গেছে এবং জাতিদাঙ্গা তো লেগেই আছে।

(৪) অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে, বহুজাতি সম্বলিত রাষ্ট্রে একাধিক জাতি দীর্ঘকাল একত্রে পাশাপাশি বাস করার ফলে তাদের মধ্যে একাত্মবোধের সৃষ্টি হয়েছে। এছাড়া উন্নত জাতির উন্নত সংস্কৃতি, জীবনধারা,

সাহিত্য, কৃষ্টির সংস্পর্শে থেকে অনুন্নত জাতিগুলি নিজেদিকে উন্নত ও বিকশিত করে নিতে পারে। উদাহরণস্বরূপ পশ্চিমবঙ্গে বসবাসকারী আদিবাসী সম্প্রদায়ের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে।

(৫) আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার একদিকে যেমন জনসমষ্টিকে ঐক্যবদ্ধ হতে অনুপ্রাণিত করে, অন্যদিকে তেমনি বিচ্ছিন্ন হতে প্ররোচিত করে এবং রাষ্ট্রীয় সংহতি নষ্ট করতে সাহায্য করে। তাই লর্ড কার্জন (Lord Curzon) এই নীতিটিকে দু'দিক ধারবিশিষ্ট তলোয়ারের (double-edged sword) সঙ্গে তুলনা করেছেন।

(৬) বহু জাতি সমন্বিত রাষ্ট্র ঐক্য ও সহযোগিতার পক্ষে বাধাস্বরূপ বলে যে কথা বলা হয় তাও ঠিক নয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সুইজারল্যান্ড প্রভৃতি রাষ্ট্রে একাধিক জাতি বাস করলেও তাদের মধ্যে ঐক্যবোধ ক্ষুন্ন হয় নি।

(৭) গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার স্বার্থে জাতিভিত্তিক রাষ্ট্র গঠনের যে যুক্তি দেখান হয় তাও বাস্তবে ভুল প্রমাণিত হয়েছে। একজাতিভিত্তিক হিটলারের জার্মানীতে জনগণ যে গণতান্ত্রিক অধিকার ভোগ করত, তা থেকে অনেক বেশি গণতান্ত্রিক অধিকার ভোগ করে বহুজাতি নিয়ে গঠিত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সুইজারল্যান্ড জনগণ।

(৮) এই নীতি প্রতিষ্ঠিত হলে পৃথিবী থেকে যুদ্ধ বিদায় নেবে বলে উড্রো উইলসন যে দাবি করেছেন সেটাও ভুল প্রমাণিত হয়েছে। এই নীতিটির প্রয়োগ ঘটিয়ে পাকিস্তান রাষ্ট্রটি সৃষ্টি হবার পর বেশ কয়েকবার ভারত পাকিস্তানের মধ্যে যুদ্ধ বেধেছে। ল্যাস্কির মতে, অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের মধ্যে প্রতিযোগিতা এবং স্বার্থের দ্বন্দ্ব যুদ্ধের অভিশাপ বহন করে আনবে।

(৯) পরিশেষে বলা যায়, বর্তমান দিনের প্রবণতা বিশ্বকে খণ্ড ক্ষুদ্র করা নয়, বরং সব দেশকে নিয়ে একটি বিশ্বরাষ্ট্র গঠন করা। শিক্ষা, জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা, অর্থনীতি, বাণিজ্য, যোগাযোগ, শিল্পকলা, পোষাক-পরিচ্ছদ, বিনোদন ইত্যাদি যেভাবে উত্তরোত্তর আন্তর্জাতিক চেহারা নিচ্ছে, তাতে ক্রমশই রাষ্ট্রীয় সীমানার বিষয়টি অপ্রাসঙ্গিক হয়ে আসছে। এই অবস্থায় জাতিভিত্তিক রাষ্ট্র গঠনের দাবি স্রোতের উল্টোদিকে সাঁতার কাটা ছাড়া কিছুই নয়। এই কারণেই লর্ড অ্যাকটন 'এক জাতি এক রাষ্ট্র' নীতিকে ''ইতিহাসের পশ্চাদগামী পদক্ষেপ'' (retrograde step in history) বলে মন্তব্য করেছেন।

উপসংহারে বলা যায়, 'এক জাতি এক রাষ্ট্র' নীতির বাস্তব প্রয়োগ বিপজ্জনক হলেও, এই নীতির নৈতিক দাবিকে উপেক্ষা করা যায় না। আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার যদি শক্তিশালী জাতিগুলির স্বৈরাচার ও অর্থনৈতিক শোষণ থেকে মুক্তির আন্দোলন হয়, তাহলে তা নিশ্চিতভাবেই সমর্থণযোগ্য। তবে স্বতন্ত্র রাষ্ট্র সৃষ্টি না করে যদি সাংবিধানিক উপায়ে যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার মাধ্যমে আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারটিকে স্বীকৃতি দেওয়া যায় তাহলে সেটাই করা উচিত।

১.৫.৩ আইনের বিভিন্ন উৎস ও তাদের আপেক্ষিক গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর। (Explain the different sources of law with their relative importance)

বিশিষ্ট আইনবিদ অস্টিনের মতে, আইন হল সার্বভৌমের আদেশ (Law is the different sources of law with their relative importance)। হল্যান্ডের মতে, আইন হল মানুষের বাহ্যিক আচার-আচরণ নিয়ন্ত্রণকারী সেইসব নিয়ম যা সার্বভৌম রাজনৈতিক কর্তৃত্ব প্রযুক্ত হয়। অনুরূপভাবে উইলসনের মতে, আইন হল মানুষের আচার-ব্যবহার ও চিন্তাধারার সেই অংশ যার পশ্চাতে সার্বভৌম কর্তৃত্বের সুস্পষ্ট সমর্থন আছে।

উপরোক্ত সংজ্ঞাগুলি থেকে মনে হবে যে আইনের একমাত্র উৎস হল সার্বভৌম শক্তি। কিন্তু আইনের উৎস একমাত্র রাষ্ট্র নয়। মানব সমাজের শুরু থেকেই আইনের আবির্ভাব ঘটেছে এবং সমাজ ও রাষ্ট্রের ন্যায় সুদীর্ঘ বিবর্তনের মধ্য দিয়ে বর্তমান অবস্থায় পৌঁচেছে। সামাজিক বিবর্তনের বিভিন্ন স্তরে প্রথা, রীতিনীতি, ধর্মীয় অনুশাসন ইত্যাদি আইনে রূপান্তরিত হয়েছে। রাষ্ট্রবিজ্ঞানী হল্যান্ড ((Holland) আইনের উৎস হিসাবে প্রথা, ধর্ম, বিচার বিভাগের রাষ্ট্র বিজ্ঞানসম্মত আলোচনা, ন্যায় বিচার এবং আইন প্রণয়নের উল্লেখ করেছেন ("The sources of law are custom, religion, judicial, scientific discussions, equity and legislation)। নিম্নে আইনের উৎসগুলিকে ব্যাখ্যা করা হল :

(১) প্রথা (Custom) **:** আইনের সবথেকে প্রাচীন উৎস হল প্রথা। দীর্ঘকাল ধরে সমাজের মধ্যে প্রচলিত আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি ইত্যাদিকে প্রথা বলে। প্রাচীন সমাজে মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ন্ত্রিত হত প্রথা, লোকাচার প্রভৃতির দ্বারা। প্রথা রাষ্ট্রের দ্বারা স্বীকৃত ও বিধিবদ্ধ হলে আইনের মর্যাদা লাভ করে। বাস্তবে কোন রাষ্ট্রই আইন রচনার ক্ষেত্রে প্রচলিত প্রথাকে উপেক্ষা করতে পারে না। কারণ, সমাজে প্রচলিত প্রথাকে অস্বীকার করে বা তার বিরুদ্ধাচরণ করে আইন রচনা করা হলে সেই আইন বলবৎ করা কঠিন হয়ে পড়ে। বস্তুত যে কোন দেশের আইন ব্যবস্থাকে খুঁটিয়ে দেখলে লক্ষ্য করা যায়, বহু আইনই প্রথার ওপর প্রতিষ্ঠিত। ভারতে হিন্দু-মুসলমান আইন মূলত প্রথাভিত্তিক। ইংল্যান্ডের অলিখিত সংবিধান মূলত প্রথার ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে। অবশ্য কোন প্রথা যুগের সঙ্গে সামঞ্জস্যহীন হয়ে পড়লে বা উপযোগিতা হারিয়ে ফেললে রাষ্ট্র তা পরিবর্তন করে বা বাতিল করে। আবার এমন অনেক প্রথা আছে যেগুলি আইন সিদ্ধ করার প্রয়োজন হয় না। যেমন ভারতীয়দের হাত তুলে নমস্কার করার দীর্ঘদিনের প্রথাটি আজও প্রথা হিসাবেই থেকে গেছে।

(২) ধর্ম (Religion) : প্রথার ন্যায় ধর্মও আইনের অতি প্রাচীন এবং গুরুত্বপূর্ণ উৎস। প্রাচীন সমাজ ব্যবস্থা মূলত ধর্মীয় অনুশাসনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হত। তাই আইন ও ধর্ম ছিল ওতপ্রোতভাবে জড়িত। আইন ও ধর্ম অভিন্ন ছিল বলে মনুসংহিতা ধর্মশাস্ত্ররূপে গণ্য হয়। যে যুগে লোকে পুরোহিতকে ঈশ্বরের প্রতিনিধি বলে ভাবতে অভ্যস্ত ছিল, সেই যুগে পুরোহিত নির্দেশিত বিধিসমূহকে আইনের মর্যাদা দিতে সমাজ ইতস্ততঃ করে নি।

প্রাচীন সমাজে প্রচলিত ধর্মীয় অনুশাসনগুলি পরবর্তীকালে রাষ্ট্রের স্বীকৃতি পেয়ে আইনের রূপ নিয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, প্রাচীন গ্রীস ও রোমের অধিকাংশ আইন ধর্মের ভিত্তিতে গড়ে উঠেছিল। উইলসন বলেন, প্রাচীন রোমক আইন কতকগুলি ধর্মীয় অনুশাসন ছাড়া কিছুই নয়। ভারতবর্ষে যেসব হিন্দু আইন ও মুসলমান আইন — যেমন উত্তারাধিকার আইন, বিবাহ, বিবাহ বিচ্ছেদ সংক্রান্ত আইন প্রচলিত আছে, সেগুলিরও উৎস ধর্ম।

(৩) বিচার বিভাগের রায় (Judicial decision) : আইনের একটি উল্লেখযোগ্য উৎস হল বিচারালয়ের বা বিচারকদের রায়। আদিম সমাজে ধর্মীয় অনুশাসন ও প্রথার ভিত্তিতে নানাবিধ দ্বন্দ্ব ও বিরোধের মীমাংসা করা হত। বিচারের কাজ করত দলপতি অথবা গোষ্ঠীপতি অথবা কোন জ্ঞানী বা বিচক্ষণ ব্যক্তি। কালক্রমে সমাজ জটিল হয়ে পড়লে বিচার-ব্যবস্থার উদ্ভব ঘটল। প্রথমদিকে বিচারকেরা প্রচলিত প্রথা ও ধর্মীয় অনুশাসনের ভিত্তিতে বিচার করলেও ক্ষেত্র বিশেষে নিজেদের বিচার-বুদ্ধি প্রয়োগ করতেন। এইভাবে বিচারকদের রায় ভবিষ্যতের আইন রূপে গণ্য হল। বর্তমান কালেও বিচারকরা প্রচলিত আইনের ভিত্তিতে বিচারের কাজ করলেও কখনও কখনও গতিশীল সমাজ ব্যবস্থার সঙ্গে তাল রাখতে গিয়ে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে নতুনভাবে আইনকে ব্যাখ্যা করেন। পরবর্তীকালে এইসব ব্যাখ্যা অনুরূপ মামলার ক্ষেত্রে নজির হিসাবে কাজ করে এবং

ধীরে ধীরে আইনের মর্যাদা লাভ করে। এইসব আইনকে বিচারক প্রণীত আইন (Judge-made law) বলা হয়। প্রখ্যাত মার্কিন বিচারপতি হোমস (Holmes) বলেছেন, বিচারকেরা আইন তৈরী করেন এবং অবশ্যই করবেন (Judges do and must legislate)। বস্তুতপক্ষে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিচার বিভাগ বহু আইন প্রণয়ন করেছে। বিচারপতি হিউজ (Hughes) একদা মন্তব্য করেন, '' আমরা সংবিধানের অধীনে থাকি; কিন্তু সংবিধান হল বিচারকরা যা বলেন তাই''(We are under the constitution; but the constitution is what the judges say it is).

(৪) ন্যায় বিচার (Equity) : অনেক সময় দেখা যায় কোন একটি বিশেষ মামলার নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে চলতি আইন যথেষ্ট নয়। এরূপ ক্ষেত্রে বিচারকরা তাঁদের নিজস্ব বিচারবুদ্ধি এবং স্বাভাবিক ন্যায়নীতির ওপর ভিত্তি করে সংশ্লিষ্ট মামলার বিচার করেন। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যেতে পারে , বিচারালয়ের রায় এবং ন্যায়বিচার উভয়েই বিচারক-প্রণীত আইনের অংশ। তবে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। বিচারালয়ের সিদ্ধান্ত দ্বারা যে আইন সৃষ্টি হয় সেখানে প্রচলিত আইনের ব্যাখ্যা পার্থক্য রয়েছে। বিচারালয়ের সিদ্ধান্ত দ্বারা যে আইন সৃষ্টি হয় সেখানে প্রচলিত আইনের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের মাধ্যমে আইনের পরিধি সম্প্রসারিত করা হয় মাত্র। কিন্তু ন্যায়নীতির দ্বারা শুধুমাত্র সেইসব ক্ষেত্রেই বিচারকার্য সম্পাদিত হয় যেখানে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আইনের কোন অস্তিত্বই নেই। তাই উইলসন বলেছেন, ''Equity too is judge-made law: but it is made not in interpretation of, but addition to, the laws which already exist..

(৫) বিজ্ঞানসম্মত আলোচনা (Scientific discussion) : বিভিন্ন দেশের আইনজ্ঞ পণ্ডিতরা বিভিন্ন সময়ে আইন সম্পর্কে যেসব রচনা প্রকাশ করে থাকেন, সেগুলিও বহু সময় আইন রচনায় সাহায্য করে। এই সমস্ত রচনাতে আইনের মূলনীতি ও উদ্দেশ্যের যে ব্যাখ্যা তাকে বিচারপতিরা সেগুলিকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। ভারতবর্ষে মনু, জীমূতবাহন, কৌটিল্য প্রভৃতি পণ্ডিতদের আলোচনা হিন্দু আইন ব্যবস্থায় উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করে আছে। এছাড়াও বর্তমানকালের রাসবিহারী ঘোষ, গুরুদাস বন্দোপাধ্যায়, দুর্গাদাস বসু প্রভৃতি পণ্ডিতদের ব্যাখ্যাকে বিচারকগণ যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। অনুরূপভাবে ইংল্যান্ডের কোক (Cock) ব্ল্যাকস্টোন (Blackstone), আমেরিকারস্টোরি (Story), কেন্ট (Kent) প্রমুখ আইনজ্ঞদের মূল্যবান আলোচনা আইনের উৎস হিসাবে কাজ করে থাকে।

(৬) আইন প্রণয়ন (Legislation) : বর্তমান দিনে আইনের প্রধান উৎস হিসাবে আইন সভা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। প্রত্যেক গণতান্ত্রিক দেশেই আইনসভাগুলিকে জনমতের দিকে লক্ষ্য রেখে বিভিন্ন আইন প্রণয়ন করতে দেখা যায়। ফলে আইনের উৎস হিসাবে প্রার্থী, ধর্মীয় অনুশাসন প্রভৃতির গুরুত্ব ক্রমশই হ্রাস পাচ্ছে। বিখ্যাত আইনবিদ ওপেনহাইম (Oppenheim) বলেছেন, বর্তমানকালে প্রথা, ধর্ম বা বিজ্ঞানসম্মত আলোচনা ইত্যাদি নয়, আইনের প্রধান এবং একমাত্র উৎস হল জনমত (There are not many sources of law but there is only one source of law, viz, common consent of community)। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য বর্তমানে শুধু আইনবিভাগ নয়, শাসকবর্গ ও আমলারাও বহু আইন তৈরী করে থাকেন।

উপসংহার : ওপরে আইনের যেসব উৎসের কথা বলা হল, সেগুলি সব যুগে সমান গুরুত্ব পায় না। আইনের উৎস হিসাবে ধর্ম, প্রথা ইত্যাদি প্রাচীনকালে যে গুরুত্ব পেত, বর্তমানে তা পায় না। পরবর্তী সময়ে বিচারালয়ের রায়, ন্যায়বিচার আইনের গুরুত্বপূর্ণ উৎস হিসাবে স্বীকৃত পেয়েছে। আধুনিককালে গণতান্ত্রিক চিন্তাধারা প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে আইনের উৎস হিসাবে আইনসভাকেই সবচেয়ে গুরুত্ব পেতে দেখা যাচ্ছে।

১.৫.৪ গণতন্ত্র ও একনায়কতন্ত্রের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ কর (Distinguish between democracy and dictatorship) :

গণতন্ত্র ও একনায়কতন্ত্র দুটি পরস্পর বিরোধী রাজনৈতিক আদর্শ। রাজনৈতিক আদর্শ হিসাবে ও শাসনব্যবস্থা হিসাবে উভয়ের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য বিদ্যমান। নীচে পার্থক্যগুলি আলোচনা করা হল :

(১) গণতন্ত্র হল জনগণের কল্যাণার্থে, জনগণের দ্বারা পরিচালিত, জনগণের শাসন। গণতন্ত্রে শাসকগোষ্ঠী হলেন জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধি। পক্ষান্তরে একনায়কতন্ত্রে কোন রাজনৈতিক দলের নেতা বা সামরিক বাহিনীর প্রধান বলপূর্বক শাসন ক্ষমতা দখল করে নিজস্ব ধ্যান-ধারণা অনুযায়ী শাসনকার্য পরিচালনা করেন। অতএব গণতন্ত্র জনগণের সার্বভৌমিকতা নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত। একনায়কতন্ত্রে কোন ব্যক্তি বা দলের হাতে সার্বভৌম ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত থাকে।

(২) গণতন্ত্রে সরকার জনগণের নিকট দায়িত্বশীল থাকে। সরকার কোন ভুল করলে বা দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হলে জনগণ তার সমালোচনা ও বিরোধিতা করতে পারে। ফলে সরকার স্বৈরাচারী হয়ে উঠতে পারে না। অন্যদিকে একনায়কতন্ত্রে সরকার কারও কাছে দায়ী থাকে না। সরকারের সবকিছু জনগণকে বিনা প্রতিবাদে মেনে নিতে হয়। সরকার অন্যায় করলেও জনগণ তার সমালোচনা বা বিরোধিতা করতে পারে না। স্বাভাবিকভাবেই একনায়কতন্ত্রে সরকার স্বৈরাচারী হয়ে ওঠে।

(৩) গণতন্ত্রে ব্যক্তির সর্বাঙ্গীণ বিকাশ ও মঙ্গলসাধনই রাষ্ট্রের চূড়ান্ত লক্ষ্য বলে বিবেচিত হয়। এখানে ব্যক্তির জন্য রাষ্ট্র, রাষ্ট্রের জন্য ব্যক্তি নয়। কিন্তু একনায়কতন্ত্রে রাষ্ট্র আগে, ব্যক্তি পরে। এখানে ব্যক্তি রাষ্ট্রের জন্য বলিপ্রদত্ত।

(৪) সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতা - এই তিনটি হল গণতন্ত্রেও মূলনীতি। জাতি, ধর্ম, স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলের সমানাধিকার প্রতিষ্ঠাই গণতন্ত্রের লক্ষ্য। অন্যদিকে একনায়কতন্ত্র সাম্য ও স্বাধীনতার নীতিতে বিশ্বাসী নয়। একনায়কতন্ত্রে জাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে বৈষম্যমূলক আচরণকে প্রশ্রয় দেওয়া হয়।

(৫) গণতন্ত্রে একাধিক রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব থাকে। বিরোধী দল সরকারের ভুলত্রুটি সমালোচনা করে সরকারকে সংযত রাখে এবং সরকারের স্বৈরাচার থেকে ব্যক্তি স্বাধীনতাকে রক্ষা করে। কিন্তু একনায়কতন্ত্রে কেবলমাত্র নায়কের দলের অস্তিত্ব ও প্রাধান্য স্বীকৃত থাকে এবং অন্যান্য দলের অস্তিত্বকে বিলোপ করা হয়। এইভাবে স্বৈরাচারিতার পথকে প্রশস্ত করা হয়।

(৬) গণতন্ত্রে স্বায়ত্তশাসনের নীতি স্বীকৃত। এখানে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে রাজনৈতিক ক্ষমতাকে তৃণমূল পর্যায় পর্যন্ত প্রসারিত করা হয়। অপরদিকে একনায়কতন্ত্রে স্বায়ত্তশাসনের অধিকারকে স্বীকার করা হয় না। এখানে স্বায়ত্তশাসনের পরিবর্তে যোগ্য নেতৃত্বের দ্বারা সুশাসনকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়।

(৭) গণতন্ত্রে পারস্পরিক আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে শাসনকার্য পরিচালিত হয় বলে জনগণের মনে কোন ক্ষোভ থাকে না। ফলে গণতন্ত্রে বিপ্লবের আশঙ্কা কম। কিন্তু একনায়কতন্ত্রে শাসকের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানাবার কোন অধিকার জনগণের থাকে না। শান্তিপূর্ণ উপায়ে সরকার পরিবর্তনের সুযোগও এখানে থাকে না। তাই একনায়কতন্ত্রে মানুষের পুঞ্জীভূত ক্ষোভ ও অসন্তোষ কোন এক সময়ে বিদ্রোহ বা বিপ্লবের আকার ধারণ করে।

(৮) গণতন্ত্রের অন্যতম ত্রুটি হল এর স্থায়িত্বের অভাব। পরস্পর বিরোধী স্বার্থের সংঘাত, দলত্যাগ, জনমতের পরিবর্তন ইত্যাদি কারণে গণতন্ত্রে ঘন ঘন সরকার পরিবর্তিত হয়। কিন্তু একনায়কতন্ত্রে একদলীয় শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত থাকে বলে দলত্যাগ, রাজনৈতিক দলাদলি, স্বার্থের দ্বন্দ্ব প্রভৃতি এখানে থাকে না। ফলে এখানে শাসনব্যবস্থা স্থায়ী হয়।

(৯) যুদ্ধ, বহিরাক্রমণ, আভ্যন্তরীণ গোলযোগ প্রভৃতি সংকটময় অবস্থার পক্ষে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা অনুপযোগী, কারণ এখানে আলাপ-আলোচনা, ভোটাভুটি ইত্যাদির মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নিতে হয়। একনায়কতন্ত্রে রাষ্ট্রনায়ক সহজেই সিদ্ধান্ত নিতে পারেন, কারণ, তাঁর সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। তাই জরুরী অবস্থা মোকাবিলার ক্ষেত্রে একনায়কতন্ত্রই বিশেষ উপযোগী।

(১০) অদক্ষ শাসন ব্যবস্থা গণতন্ত্রের অপর একটি ত্রুটি। এখানে যোগ্যতার ভিত্তিতে প্রতিনিধি নির্বাচিত হয় না। কার্লাইল বলেন, গণতন্ত্র হল নির্বোধের শাসন। কিন্তু একনায়কতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা প্রকৃতিগতভাবে সুদক্ষ হয়। নায়কের সুদক্ষ নেতৃত্বে দেশ সহজে এগিয়ে যায়।

(১১)গণতন্ত্রের ভিত্তি হল জনগণের সম্মতি। সরকারের স্থায়িত্ব নির্ভর করে জনগণের সম্মতির ওপর। জনগণ ইচ্ছা করলে সরকারের পরিবর্তন করতে পারে। অপরপক্ষে একনায়কতন্ত্রের ভিত্তি হল পশুশক্তি। এখানে পুলিশ, মিলিটারি প্রভৃতির সাহায্যে শাসক তাঁর স্বৈরাচারী শাসন বলপূর্বক জনগণকে মানতে বাধ্য করে।

(১২)বিশালকায় রাষ্ট্রের পক্ষে গণতন্ত্র বিশেষ উপযোগী। কারণ এখানে ক্ষমতা বিকেন্দ্রীভূত থাকে। কিন্তু একনায়কতন্ত্রে ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত থাকে বলে বৃহদায়তন বিশিষ্ট রাষ্ট্রে একজন মাত্র শাসকের পক্ষে সুশাসন প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয় না। বিশাল দেশের বিবিধ সমস্যার প্রতি নজর দেওয়া একনায়কের পক্ষে কোনমতেই সম্ভব হয় না।

(১৩)গণতন্ত্র বিশ্বশান্তি তথা শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান নীতিতে বিশ্বাসী। গণতন্ত্র যুদ্ধকে ঘৃণা করে। অপরপক্ষে একনায়কতন্ত্র জাতিগত শ্রেষ্ঠত্বের আদর্শকে প্রচার করে উগ্র জাতীয়তাবাদের জন্ম দেয়। আর এই উগ্র জাতীয়তাবাদ দেশকে অনিবার্যভাবে যুদ্ধের দিকে ঠেলে দেয়। একনায়কতন্ত্রে যুদ্ধের জয়গান গাওয়া হয়। মুসোলিনী বলতেন 'স্ত্রীলোকের কাছে মাতৃত্ব যেমন কাম্য, পুরুষের কাছে যুদ্ধও তেমনি কাম্য'। অর্থাৎ একনায়কতন্ত্র বিশ্বশান্তির পরিপন্থী।

(১৪)জাতীয় ঐক্য ও সংহতি প্রতিষ্ঠার দিক থেকে বিচার করলে একনায়কতন্ত্রকে গণতন্ত্রের তুলনায় আদর্শ শাসনব্যবস্থা বলা যেতে পারে। কারণ গণতন্ত্রের ন্যায় একনায়কতন্ত্রে দলীয় কোন্দল, আঞ্চলিকতাবাদ, বিচ্ছিন্নতাবাদ ইত্যাদি প্রশ্রয় পায় না।

(১৫)অনেকের মতে, গণতন্ত্রের তুলনায় একনায়কতন্ত্রে দ্রুত আর্থিক উন্নয়ন সম্ভব হয়। একনায়কতন্ত্রে আন্দোলন, ধর্মঘট, বন্ধ ইত্যাদিকে প্রশ্রয় দেওয়া হয় না বলে উৎপাদন অব্যাহত থাকে।

(১৬)অনেকের মতে গণতন্ত্রের তুলনায় একনায়কতন্ত্রে সরকারী ব্যয় অনেক কম। গণতন্ত্রে নির্বাচন ও প্রশাসনে যে পরিমাণে ব্যয় হয়, একনায়কতন্ত্রে সরকারী ব্যয় সে তুলনায় অনেক কম। তবে গণতন্ত্রে সরকারী রাজস্বের অধিকাংশটাই উন্নয়নমূলক ও জনকল্যাণকর কাজে ব্যয় হয়। অপরপক্ষে একনায়কতন্ত্রে রাষ্ট্রনায়ক উন্নয়ন খাতে ব্যয় কম করে গুপ্তচর বাহিনী, সামরিক বাহিনী প্রভৃতির পিছনেই বেশি অর্থ ব্যয় করে।

উপসংহার : উপরোক্ত আলোচনা থেকে দেখা যাচ্ছে, গণতন্ত্র ও একনায়কতন্ত্র উভয়েই দোষে-গুণে ভরা। তবে তুলনামূলক বিচারে, বিশেষ করে আদর্শ ও গুণগত উৎকর্ষের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে গণতন্ত্রকেই শ্রেষ্ঠ শাসনব্যবস্থার মর্যাদা দিতে হয়। সাম্য, স্বাধীনতা, স্বায়ত্তশাসন ইত্যাদি অমূল্য সম্পদগুলি কেবলমাত্র গণতন্ত্রেই মানুষ পেতে পারে। স্বাধীনতাহীনতায় কেউ বাঁচতে চায় না। তাছাড়া গণতন্ত্রের তুলনায় একনায়কতন্ত্রে সুশাসন সম্ভব হয় সত্য। কিন্তু সুশাসন কখনই স্বায়ত্তশাসনের বিকল্প হতে পারে না। ব্রিটিশ ভারতে যথেষ্ট সুশাসন ছিল, তবুও অগণিত ভারতবাসী মরণপণ লড়াই করেছে, রক্ত দিয়েছে শুধু স্ব-শাসনের জন্যে। ব্যানারম্যান (H.C. Bannerman) যথার্থই বলেছেন, একনায়কতন্ত্রের অধীনে সুশাসনের চেয়ে স্বায়ত্তশাসনের অধীনে মন্দ শাসনই শ্রেয় (Better bad government under self government than good government under dictatorship)। তবে একথা ঠিক উদারনৈতিক বা বুর্জোয়া গণতন্ত্রে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সাম্য থাকে না বলে গণতন্ত্র প্রকৃতরূপে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। অর্থনৈতিক সাম্যের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাই হল গণতন্ত্রের শ্রেষ্ঠ পীঠস্থান।

১.৬. সারসংক্ষেপ (Summary)

১৭০১ সালে লিবনিজ রাষ্ট্রবিজ্ঞান কথাটি প্রথম ব্যবহার করেন। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সংজ্ঞায় গার্নার বলেছেন - ''রাষ্ট্রবিজ্ঞান আলোচনার সূচনা ও সমাপ্তি রাষ্ট্রকে নিয়ে।'' এছাড়াও ব্লুন্টসলী, বার্জেস, লীকক, সিলি গেটেল, ব্যাফেল প্রমুখ রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সংজ্ঞা দিয়েছেন। অন্যদিকে গ্রাহাম ওথালাস, বেন্টলি, লাসওয়েল অ্যালানবল, জেভিড ইস্টন, রবসন প্রমুখ রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আধুনিক সংজ্ঞা দিয়েছেন।

রাষ্ট্রবিজ্ঞান একটি গতিশীল বিদ্যা। অ্যারিস্টটলের মতে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয় হল সামাজিক বিষয় ও সমস্যা। রাষ্ট্রবিজ্ঞান রাষ্ট্রের তত্ত্ব সংগঠন শাসন প্রণালী, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, আন্তর্জাতিক আইন, সংগঠন, রাজনৈতিক ব্যবস্থা, রাজনৈতিক দল, স্বার্থগোষ্ঠী, ক্ষমতা প্রভৃতি নিয়ে আলোচনা করে।

১.৭. গ্রন্থপঞ্জী (References)

১) প্রামাণিক, নিমাই, রাষ্ট্রবিজ্ঞানের রূপরেখা, ছায়া প্রকাশনী, মার্চ - ২০০৫।

২) দালাল, প্রণব কুমার, রাষ্ট্রবিজ্ঞান সমগ্র, আরামবাগ বুক হাউস।

৩) মুখোপাধ্যায়, অমল কুমার, উচ্চমাধ্যমিক রাষ্ট্রবিজ্ঞান, শ্রীধর পাবলিশার্স।

৪) সিংহ, দেবব্রত, উচ্চমাধ্যমিক রাষ্ট্রবিজ্ঞান শিক্ষক, ছায়া প্রকাশনী।

৫) দত্ত, মৃণালকান্তি, উচ্চমাধ্যমিক রাষ্ট্রবিজ্ঞান সমগ্র, এ.বি.এস পাবলিশিং হাউস।

৬) মজুমদার, স্মৃতিকণা, রাষ্ট্রবিজ্ঞান শিক্ষণ পদ্ধতি, রীতা পাবলিকেশন।

৭) হালদার, শ্রী গৌরদাস, শিক্ষা প্রসঙ্গে অর্থনীতি ও পৌরবিজ্ঞান, ব্যানার্জী পাবলিশার্স।

১.৮. প্রশ্নাবলী (Self Checked Question)

১. রাষ্ট্রবিজ্ঞান বলতে কী বোঝায়?

২. রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আধুনিক সংজ্ঞা দিন।

৩. রাষ্ট্রবিজ্ঞানের পরিধি নিয়ে আলোচনা করুন।

৪. রাষ্ট্রবিজ্ঞান কি বিজ্ঞান পদবাচ্য?

৫. গণতন্ত্র ও একনায়কতন্ত্রের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করুন।

৬. রাষ্ট্রবিজ্ঞানের জনক কাকে বলে? (B.Ed Exam-2013)

৭. 'আইন হল স্বাধীনতার শর্ত' - ব্যাখ্যা কর। (B.Ed Exam-2013)

৮. পশ্চিমবঙ্গের গ্রাম পঞ্চায়েতের গঠন ও কার্যাবলী আলোচনা করুন। (B.Ed Exam-2013)

৯. রাষ্ট্রগঠনের গুরুত্বপূর্ণ উপাদানগুলি ব্যাখ্যা করুন। (B.Ed Exam-2013)

১০. ''অধিকার ও কর্তব্য হল একই মুদ্রার দুটি দিক'' - ব্যাখ্যা করুন। (B.Ed Exam-2013)

১১. ভারতীয় দল ব্যবস্থার মূল বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা করুন। (B.Ed Exam-2013)

একক - ২

একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর বিষয়বস্তু শিক্ষাতাত্ত্বিক পাঠ বিশ্লেষণ (Pedagogical Analysis on the Contents of the Syllabus of Classes XI & XII)

এককের গঠন বিন্যাস (Structure)

২.১ উদ্দেশ্য

২.২ সূচনা

২.৩ শিক্ষাতাত্ত্বিক পাঠ বিশ্লেষণ

২.৪.১ শিক্ষাতাত্ত্বিক পাঠ বিশ্লেষণ - ১

২.৪.২ শিক্ষাতাত্ত্বিক পাঠ বিশ্লেষণ - ২

২.৪.৩ শিক্ষাতাত্ত্বিক পাঠ বিশ্লেষণ - ৩

২.৪.৪ শিক্ষাতাত্ত্বিক পাঠ বিশ্লেষণ - ৪

২.৪.৫ শিক্ষাতাত্ত্বিক পাঠ বিশ্লেষণ - ৫

২.৫ সারসংক্ষেপ

২.৬ গ্রন্থপঞ্জী

২.৭ প্রশ্নাবলী

২.১ উদ্দেশ্য (Objectives)

এই এককটি পাঠ করে শিক্ষার্থীরা -

- Pedagogy শব্দটির উৎপত্তি সম্পর্কে ধারণা লাভ করবেন।
- Pedagogy শব্দটির অর্থ কি তা বিশ্লেষণ করতে পারবেন।
- শিক্ষাতাত্ত্বিক পাঠ বিশ্লেষণ (Pedagogy)-এর পর্যায়গুলির বর্ণনা করতে পারবেন।
- বিভিন্ন অধ্যায়ের একক ও উপ-এককের বিন্যাস করতে পারবেন।
- বিভিন্ন অধ্যায়ের স্তরবিন্যাস ও পুনঃস্তরবিন্যাস করতে পারবেন।
- বিভিন্ন উপ-এককের (Teaching Strategies) স্থির করতে পারবেন।
- C.R.T. তৈরী করতে পারবেন।

২.২ সূচনা (Introduction)

বর্তমান আধুনিক শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থার অন্যতম বিষয় হল শিক্ষাতাত্ত্বিক পাঠ বিশ্লেষণ বা (Pedagogical Analysis)। গ্রিক পেডাগজিও (Pedagogio) শব্দ থেকে পেডাগজি (Pedagogy) শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে। Pedagogy শব্দটি গ্রিক শব্দ Pedia ও Goges থেকে এসেছে। Pedia শব্দটির অর্থ হল শিশু এবং Goges শব্দটির অর্থ হল জ্ঞান। অর্থাৎ শিশুকে শিক্ষা দেওয়ার সরল ও বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় হল পেডাগজি। অনেকে পেডাগজি-র ব্যুৎপত্তিগত অর্থে To lead the child অর্থাৎ শিশুকে দেখা শোনা করার কথাও বলেছেন। প্রাচীন গ্রিসে 'পেডাগজিও' বলা হত এমন এক শ্রেণির প্রভুভক্ত বিশ্বাসী কর্মী বা ভৃত্যদের যারা প্রভুর পুত্রের শিক্ষা সংক্রান্ত ক্ষেত্রগুলি দেখভাল করত, সহযোগিতা করত, ফাইফরমাস খাটত ইত্যাদি। স্কুলে বা জিমে শিশুকে পৌঁছে দেওয়া, সেখানের উপকরণ, সাজ-সরঞ্জাম ইত্যাদি সঙ্গে করে বয়ে নিয়ে যাওয়া - এসবই ছিল তাদের কাজ। এই সময় মেয়েদের প্রকাশ্য শিক্ষা গ্রহণের অধিকার ছিল না।

পরবর্তীতে ইংরেজি বিশ্ব শিক্ষার আঙিনায় পেডাগজি শব্দটি খুবই তাৎপর্যের সঙ্গে গৃহীত হয়েছে এবং এর অর্থের বিরাট উৎকর্ষ সাধিত হয়েছে। Pedagogical Analysis বলতে শিক্ষা বিজ্ঞানের উপর ভিত্তি করে শিক্ষণীয় বিষয়বস্তুর বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ। কোন শিক্ষণীয় বিষয় শ্রেণীকক্ষে উপস্থাপন করার পূর্বে শিক্ষক সেই বিষয় শিক্ষাবিজ্ঞানের নীতি ও পদ্ধতি অনুযায়ী বিচার বিশ্লেষণ করে পাঠদানের একটি বিশদ রূপরেখা তৈরী করে নিতে পারেন এবং সেই রূপরেখা অনুসারে পাঠদানে অগ্রসর হতে পারেন। ইংরেজি Pedagogy ও Pedagogy দুটি বানানের অর্থই হল Art of Teaching বা Science of Teaching। সুতরাং এর অর্থ হল শিক্ষণ শৈলীর বিদ্যা।

তবে উল্লেখযোগ্য যে 'পেডাগজি' শব্দটি শিশুদের শিক্ষার ক্ষেত্রে গ্রহণ করা হলেও বড়োদের শিক্ষার ক্ষেত্রে অনেকে শব্দটিকে হুবহু ব্যবহার করছেন না। যেমন প্রাপ্তবয়স্ক শিক্ষার্থী তথা Adult learners-দের জন্য পেডাগজিকে বলা হচ্ছে 'Critical Pedagogy'। এটি হল Critical Conciousness-এর স্তরে উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য সাহায্যকারী theory এবং তার অনুশীলনী। শিক্ষাতাত্ত্বিকেরা কেউ কেউ Pedagogy-এর পরিবর্তে Andragogy পরিভাষাটি ব্যবহার করেছেন।

অবশেষে বলা যায় অনেক শিক্ষাবিদ এই পেডাগজি তত্ত্বের উপর আলোকপাত করেছেন এবং তত্ত্বটি নির্মাণে সহযোগিতা করেছেন। এদের মধ্যে কয়েকজনের নাম উল্লেখ করা যায়। যেমন - ফ্রয়েবেল, ডিউই, পিঁয়াজে, ওয়াটকিন্‌স, কোমেন্সকি, বি.এস.ব্লুম প্রমুখ। তবে আমরা পেডাগজি সংক্রান্ত আলোচনার প্রাণকেন্দ্র হিসাবে অধ্যাপক বি.এস.ব্লুম (১৯১৩-১৯৯৯) এর Taxonomy তত্ত্বটি অনুসরণ করে থাকি।

২.৩ শিক্ষাতাত্ত্বিক পাঠ বিশ্লেষণ (Pedagogical Analysis)

উপরিউক্ত আলোচনায় পেডাগজি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত ধারণা দেওয়া হয়েছে। এবার শিক্ষাতাত্ত্বিক পাঠ বিশ্লেষণ যে কয়েকটি পর্যায়ের মাধ্যমে সম্পূর্ণ হয় তা আলোচনা করা হল ঃ

১ম পর্যায় ঃ পেডাগজিক্যাল অ্যানালিসিস তথা পাঠ এককের শিক্ষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণের প্রথম পর্যায়টি হল বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ। এখানে আমরা সমগ্র পাঠ্যাংশটিকে বিষয় স্বাতন্ত্র্যের নিরিখে কিংবা শিক্ষণ এককের

দৃষ্টিকোণ থেকে কতকগুলি উপ-এককে বিশ্লেষণ করি। সাধারণভাবে যখন একটি এককে নির্দিষ্ট করা হয় তখন সেটিকে একদিনে পড়ানো সম্ভব হয় না। তখন যেটুকু অংশ একটি পিরিয়ড-এ আলোচনা করা যায় সেই অংশটিকে একটি উপ-একক ধরা হয়। শিক্ষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণে আমরা মূল পাঠ্যাংশ বা content-টিকে যতগুলি উপ-এককে ভাগ করা যায় ভাগ করে নিই এবং সেটি পিরিয়ড সংখ্যা নির্দিষ্ট করে নিই।

২য় পর্যায় ঃ শিক্ষাতাত্ত্বিক পাঠ একক বিশ্লেষণের জন্য দ্বিতীয় পর্যায়ে আমরা যে কোনো উপ-একক নির্দিষ্ট করে, সেই উপ-এককের গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়গুলি তথা সার বিষয়বস্তুকে সংক্ষেপে চিহ্নিত করে নিই। আলোচনার প্রাণবিন্দুগুলি চিহ্নিত করে দেওয়ায় আমাদের এই পর্যায়ের কাজ।

৩য় পর্যায় ঃ বিশ্লেষণের তৃতীয় পর্যায়ে স্তরবিন্যাস (sequence) এবং পুনঃস্তরবিন্যাস (resequence) করা হবে আলোচ্য উপ-এককটির। এবং এই পর্যায়ে শিক্ষক নিজের মত করে উপ-এককটিকে পরপর স্তরে স্তরে সাজিয়ে নিতে পারেন।

৪র্থ পর্যায় ঃ শিক্ষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণের চতুর্থ পর্যায়ে পরিকল্পনা করে নেওয়া হয় আলোচ্য উপ-এককটি পাঠদানের মাধ্যমে কোন কোন উদ্দেশ্য সমূহের বাস্তবায়ন ঘটানো সম্ভব। শিক্ষার্থীর বিকাশ প্রক্রিয়াকে আমরা কোন কোন পথে চরিতার্থ করতে পারি সংশ্লিষ্ট পাঠ্য এককটির পূর্ণাঙ্গ উপস্থাপনের মাধ্যমে। প্রফেসর ব্লুম-এর জ্ঞানমূলক মাত্রা (Cognitive Domain), অনুভূতির মাত্রা (Affective Domain) এবং মনশ্চালক বা সঞ্চালনমূলক মাত্রা (Psychomotor Domain) গুলি থেকে মোটামুটিভাবে চারটি উদ্দেশ্যকে এখানে উল্লেখ করা হয়। সেগুলি হল -

(১) জ্ঞানমূলক উদ্দেশ্য ঃ জ্ঞানমূলক পর্যায়ে আমরা মূলত স্মরণক্রিয়ার সামর্থ্য বিকাশের কথা ভাবি। সনাক্ত করতে পারা, ব্যক্ত করতে পারা, স্মরণ করতে পারা প্রভৃতি action verb গুলি উদ্দেশ্যের ভাবিক প্রকাশনায় আমরা ব্যবহার করে থাকি।

(২) বোধমূলক উদ্দেশ্য ঃ এই স্তরে শিক্ষার্থীদের আলোচ্য বিষয়বস্তু সম্পর্কে বোধ জাগ্রত হবে। এখানে রূপান্তরকরণ (translation), মন্তব্যকরণ (Interpretation) এবং জানা থেকে অজানার অনুমান (extrapolation) বিদ্যমান। কেন, কীভাবে, তুলনা, ব্যাখ্যা প্রভৃতি action verb গুলি বোধমূলক উদ্দেশ্যের ভাষিক প্রকাশনায় আমরা ব্যবহার করে থাকি।

(৩) প্রয়োগমূলক উদ্দেশ্য ঃ জ্ঞান ও বোধের পরবর্তী স্তরটি হল প্রয়োগ সামর্থ্যের স্তর। এই স্তরে শিক্ষার্থীরা বিষয়বস্তুর উপাদান বিশ্লেষণ, সংশ্লেষণ ও মূল্যায়ন করতে সক্ষম হবে এমনটি আশা করা যায়। এখানে শিক্ষার্থীর অনুভূতি, মনোভাব, ইচ্ছা, আবেগ ইত্যাদি প্রকাশের সামর্থ্য বিকশিত হয়। তাৎপর্য, পার্থক্য, বিশ্লেষণ, গুরুত্ব প্রভৃতি action verbগুলি প্রয়োগমূলক উদ্দেশ্যের ভাষিক প্রকাশনায় আমরা ব্যবহার করে থাকি।

(৪) দক্ষতামূলক উদ্দেশ্য ঃ এই উদ্দেশ্যের ভিত্তিই হল দেহের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পেশিসমূহের সঞ্চালনার সামর্থ্য। এই স্তরে বিভিন্ন চিত্র অঙ্কন, মডেল তৈরি, চার্ট তৈরি, মানচিত্র অঙ্কন প্রভৃতি teaching aids তৈরী সংক্রান্ত গুণের বিকাশ শিক্ষার্থীদের ঘটে থাকে।

৫ম পর্যায় ঃ পাঠ এককের শিক্ষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণের পঞ্চম পর্যায়টি হল শিক্ষণ কৌশল (teaching strategies) পরিকল্পনার স্তর। শিক্ষণ কৌশল পরিকল্পনার প্রথম স্তরে আমরা বিশদ পাঠদান পদ্ধতি স্থির করে

নিই। নির্দিষ্ট উপ-এককটি বিজ্ঞানসম্মত শিক্ষণ উপস্থাপনার জন্য কোন পদ্ধতিসমূহের উপর কীভাবে গুরুত্ব আরোপিত হবে, তা এই পর্যায়ে পরিকল্পনা করে নেওয়া হয়। যেমন পাঠ্যাংশ উপস্থাপনার জন্য বক্তৃতা পদ্ধতি, আলোচনা পদ্ধতি, প্রশ্নোত্তর পদ্ধতি, নাটক পদ্ধতি, প্রজেক্ট পদ্ধতি যাই আমরা ব্যবহার করতে চাই না কেন সেগুলির প্রসঙ্গ নির্দেশ করে স্থির করে নেওয়া হবে।

এই পর্যায়ে নির্দিষ্ট করে নেব আমরা শিক্ষা উপকরণ ও প্রদীপন কী কী, কোথায় এবং কীভাবে ব্যবহার করতে পারি। শিক্ষা প্রদীপন হিসাবে আমরা চার্ট, মডেল, চিত্র প্রদীপন, ম্যাপ, গান, সংলাপের সিডি, ক্যাসেট ইত্যাদি ব্যবহার করতে পারি। এই পর্যায়েই স্থিরীকৃত হবে চক ও ব্ল্যাকবোর্ড ব্যবহারের সুস্পষ্ট পরিকল্পনা। বোর্ডের কাজ হবে প্রাসঙ্গিক, তাৎপর্যবাহী এবং একই সঙ্গে আকর্ষণীয়। এখানে অনুসন্ধানী প্রশ্নকে গুরুত্ব দিতে হবে।

শিক্ষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণের শিক্ষণ কৌশল বিষয়বস্তু আলোচনায় ব্যবহৃত বিভিন্ন উদাহরণ-এর পরিকল্পনা করতে হবে। পাঠ্য বিষয়টিকে মনোগ্রাহী, তাৎপর্যবাহী, ব্যাপকতাবাহী করে তোলার জন্য আমরা শ্রেণি শিক্ষণে বিভিন্ন গল্প, ঘটনা, তুলনা করতে পারি।

আলোচনার কোন অংশকে জীবন্ত ও মূর্ত করে তোলার জন্য এমন দৃষ্টান্তগুলি ব্যবহারের গুরুত্ব অপরিসীম।

৬ষ্ঠ পর্যায় ঃ শিক্ষণ কৌশলের সামগ্রিকতা নির্ধারণ করার পর আমাদের অভীক্ষাপত্রের একটি খসড়া পরিকল্পনা করতে হবে। এখানে আমরা জানার চেষ্টা করব, যে উদ্দেশ্যগুলির ভিত্তিতে আমাদের শিক্ষণ আয়োজন সম্পাদিত হয়েছে, সেই উদ্দেশ্যগুলি কতখানি বাস্তবায়িত হতে পেরেছে। সেই কারণে জ্ঞান, বোধ, প্রয়োগ, দক্ষতা ইত্যাদি উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে প্রশ্নের প্রকৃতি এবং সংখ্যা নির্দিষ্ট করা হবে। উদ্দেশ্যভিত্তিক প্রশ্নাবলীর খসড়াটি অনুসরণ করেই তৈরী করা হবে অভীক্ষাপত্র। উপ-এককটি শিক্ষণের সার্থকতা যাচাই করার জন্যই এই মূল্যায়ন পরিকল্পনা।

পাঠ এককের শিক্ষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণের বা পেডাগজিক্যাল অ্যানালিসিসের (Pedagogical Analysis) প্রতিটি স্তর আলোচনার পরিশেষে আমরা স্পষ্টতই বুঝতে পারি; আমরা শিক্ষণ বৃত্তিটি বিজ্ঞানসম্মতভাবে সম্পূর্ণ করতে চাই এই বিশ্লেষণী পরিকল্পনার মাধ্যমে। আমরা প্রথমে ঠিক করেছি → কি পড়াতে চাই? তারপর নির্দিষ্ট করেছি → কেন পড়াতে চাই? তারপর স্থিরীকৃত হয়েছে → কীভাবে পড়াতে চাই? পরিশেষে দেখতে চাওয়া হয়েছে → পড়ানো সার্থক হলো কি না? এই মৌলিক প্রশ্নগুলির ভিত্তিতেই একে একে আমরা পেলাম বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ, শিক্ষণ উদ্দেশ্য নির্ধারণ, বিশদ শিক্ষণ কৌশল স্থিরীকরণ এবং পরিশেষে মূল্যায়ন। মূল্যায়নের পরিণতির উপর নির্ভর করেই স্থিরীকৃত হবে পরবর্তী শিক্ষণ কৌশল।

২.৪.১ ● শিক্ষাতাত্ত্বিক পাঠ বিশ্লেষণ - ১ (Pedagogical Analysis No - 1)

Identification of Units and Sub-units

একক	উপ-একক	পিরিয়ড সংখ্যা	মোট পিরিয়ড
সরকারের বিভিন্ন বিভাগ	(ক) শাসন বিভাগ	২	৬
	*(খ) আইন বিভাগ	২	
	(গ) বিচার বিভাগ	২	

*চিহ্নিত উপ-এককটি বিশ্লেষণ করা হল।

- **Summerization of the Essence of Each Unit :**

রাষ্ট্রের বিমূর্ত ধারণা সরকারের মাধ্যমে বাস্তব রূপ পরিগ্রহ করে। প্রতিটি গণতান্ত্রিক সরকার নিজস্ব তিনটি বিভাগের সাহায্যে যাবতীয় কার্য সম্পাদন করে। তিনটি বিভাগ হল শাসন বিভাগ, আইন বিভাগ ও বিচার বিভাগ। শাসন বিভাগের গঠন ও কার্যাবলীর ভিত্তিতে শাসন বিভাগকে দুটি ভাগে ভাগ করা হয় : যথা - শাসন বিভাগের রাজনৈতিক অংশ এবং অ-রাজনৈতিক অংশ। শাসন বিভাগ, নীতি নির্ধারণ, সিদ্ধান্ত গ্রহণ, আভ্যন্তরীণ শাসনকার্য পরিচালনা করে। আইন সভাকে দুটি ভাগে ভাগ করা যায়। যথা - এককবিশিষ্ট আইন সভা এবং দ্বিকক্ষবিশিষ্ট আইন সভা। আইন সভা আইন প্রণয়ন, শাসন সংক্রান্ত কার্য, অর্থ সংক্রান্ত কার্য পরিচালনা করে। প্রতিটি গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় বিচার বিভাগের গুরুত্ব অপরিসীম। ব্যক্তি স্বাধীনতা সংরক্ষণ, আইন ভঙ্গকারীর শাস্তি বিধান, সংবিধানের পবিত্রতা রক্ষা ইত্যাদি বিচার বিভাগের কাজ।

- **Sequence and Resequence of the Unit :**

আমি যে অধ্যায়ের একক বিন্যাস করতে চলেছি সেই অধ্যায়ের নাম হল সরকারের বিভিন্ন বিভাগ। তার বিভিন্ন একক বিন্যাস হল -

- শাসন বিভাগ
- আইন বিভাগ
- বিচার বিভাগ

আইন বিভাগের উপ-একক বিন্যাস হল -

- আইন সভার গঠন
- দ্বিকক্ষবিশিষ্ট আইন সভার স্বপক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তি
- আইন সভার কার্যাবলী ও ভূমিকা

- **Specification of Instructional Objectives :**

শিক্ষক মহাশয়ের আইন বিভাগ সম্পর্কিত শিক্ষাদান শিক্ষার্থীর জ্ঞানমূলক, বোধমূলক, প্রয়োগমূলক ও দক্ষতামূলক সামর্থ্য ও উদ্দেশ্য বিকাশ সাধন করে।

জ্ঞানমূলক : সাংগঠনিক দিক থেকে আইন সভাকে কটি ভাগে ভাগ করা যায় তা শিক্ষার্থীরা জানতে পারবে।

বোধমূলক : শিক্ষার্থীরা এককক্ষ ও দ্বিকক্ষবিশিষ্ট আইন সভার পার্থক্য নির্ণয় করতে পারবে।

প্রয়োগমূলক : ভারতের আইন সভা এককক্ষবিশিষ্ট না দ্বিকক্ষবিশিষ্ট তা নিরূপণ করতে পারবে।

দক্ষতামূলক : শিক্ষার্থীরা আইন সভার বিভিন্ন কাজের একটি তালিকা তৈরী করতে পারবে।

- **Selection of Teaching Strategies :**

আইন সভার সংজ্ঞা ও শ্রেণীবিভাগ বক্তৃতা পদ্ধতি এবং আইন সভার কার্যাবলী আলোচনা পদ্ধতির মাধ্যমে উপস্থাপন করা হবে। ভারতীয় পার্লামেন্ট ও ব্রিটিশ পার্লামেন্ট হাউসের ছবি ও আইন সভার কার্যাবলীর একটি তালিকা করে উপস্থাপন করা হবে। নানা দেশের আইন সভার উচ্চ ও নিম্নকক্ষের নাম উদাহরণ হিসাবে বোর্ডে শিক্ষিকা মহাশয়া লিখবেন। দ্বিকক্ষবিশিষ্ট আইন সভার পক্ষে ও বিপক্ষে গুরুত্বপূর্ণ যুক্তিগুলিও বোর্ডে লিখবেন।

- **Selection of Teaching Aids with note on their preparation and Mode of Use :**

(ক) শিক্ষিকা মহাশয়া আইন বিভাগের ও তথ্য অংশগুলির রোলবোর্ডের মাধ্যমে দেখাতে পারবেন।

(খ) আইন বিভাগের কার্যাবলীকে চার্টের মাধ্যমে দেখাবেন।

- **Questioning with Reference to specific Objectives :**

১) সাংগঠনিক দিক থেকে আইন সভাকে কটি ভাগে ভাগ করা যায় ও কী কী? (জ্ঞানমূলক)

২) কোন কোন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী দ্বিকক্ষবিশিষ্ট আইন সভার পক্ষে মত প্রকাশ করেছেন? (জ্ঞানমূলক)

৩) দ্বিকক্ষবিশিষ্ট আইন সভা বলতে কী বোঝ? (দক্ষতামূলক)

৪) আইন সভার কার্যাবলীর একটি চার্ট তৈরী কর। (দক্ষতামূলক)

Criterion Referenced Test

উপ-একক	উদ্দেশ্য	প্রশ্নের নং	প্রশ্নের মান	মোট	শতকরা
আইন সভার গঠন	জ্ঞানমূলক	১,২	২+১	৩	৩০%
দ্বিকক্ষবিশিষ্ট আইন	বোধমূলক	৩	২	২	২০%
সভার পক্ষে ও	প্রয়োগমূলক	৪	৩	৩	৩০%
বিপক্ষে যুক্তি আইন সভার কার্যাবলী ও দক্ষতা, ভূমিকা	দক্ষতামূলক	৫	২	২	২০%
				১০	১০০%

২.৪.২ ● শিক্ষাতাত্ত্বিক পাঠ বিশ্লেষণ - ২ (Pedagogical Analysis No - 2)

Identification of Units and Sub-units

একক	উপ-একক	পিরিয়ড সংখ্যা	মোট পিরিয়ড
সরকারের বিভিন্ন রূপ	*(ক) এককেন্দ্রিক সরকার	২	৪
	(খ) যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার	২	
	(গ) রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার	২	
	(ঘ) ক্যাবিনেট পরিচালিত সরকার	২	

*চিহ্নিত উপ-এককটি বিশ্লেষণ করা হল।

- **Summerization of the Essence of Each Unit :**

যখন কোনো শাসনব্যবস্থায় সরকারের যাবতীয় ক্ষমতা একটি মাত্র ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ অর্থাৎ কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে কেন্দ্রীভূত থাকে তখন তাকে এককেন্দ্রীক সরকার বলে।

বৈশিষ্ট্য : কেন্দ্রীয় সরকারের একক প্রাধান্য, কেন্দ্রীয় আইন সভার প্রাধান্য, সংবিধান লিখিত অথবা অ-লিখিত হতে পারে, সংবিধান সুপরিবর্তনীয় হয়, বিচার বিভাগ অত্যন্ত দুর্বল হয় এবং জনগণ এক নাগরিকত্বের স্বীকৃতি পায়।

গুণ : ১) একটিমাত্র সরকার থাকায় শাসনব্যবস্থা ব্যয়বহুল হয় না।

২) আঞ্চলিক সরকারের হাতে অর্পিত ক্ষমতা ফিরিয়ে আনতে পারে।

৩) এই ধরনের সরকার সুপরিবর্তনীয়।

৪) এই ধরনের সরকার সুপরিচালিত ও শক্তিশালী হয়।

ত্রুটি : ১) আঞ্চলিক সরকারগুলি সম্পূর্ণরূপে কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন থাকে।

২) কেন্দ্রের পক্ষে আঞ্চলিক সমস্যা জানা সম্ভব হয় না।

৩) কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে স্বৈরাচারী হয়ে ওঠা সম্ভব।

- **Sequence and Resequence of the Unit :**

আমি যে অধ্যায়ের একক বিন্যাস করতে চলেছি সেই অধ্যায়ের নাম হল সরকারের বিভিন্ন রূপ। তার বিভিন্ন একক বিন্যাস হল -

- এককেন্দ্রিক সরকার

- যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার

- রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার

- ক্যাবিনেট পরিচালিত সরকার

এককেন্দ্রীক সরকারের উপ-একক বিন্যাস হল -

- এককেন্দ্রিক সরকারের সংজ্ঞা

- এককেন্দ্রিক সরকারের বৈশিষ্ট্য

- এককেন্দ্রিক সরকারের গুণ ও ত্রুটি

- **Specification of Instructional Objectives :**

শিক্ষিকা মহাশয়ার এককেন্দ্রিক সরকার সম্পর্কিত শিক্ষাদান শিক্ষার্থীর জ্ঞানমূলক, বোধমূলক, প্রয়োগমূলক ও দক্ষতামূলক সামর্থ্য ও উদ্দেশ্য বিকাশ সাধন করে।

জ্ঞানমূলক : শিক্ষার্থীরা জানবে ও বলতে পারবে এককেন্দ্রিক সরকার কাকে বলে।

বোধমূলক : এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থা স্বৈরতান্ত্রিক হয়ে উঠতে পারে কেন তা শিক্ষার্থীরা যুক্তি দিয়ে বুঝিয়ে দিতে পারবে।

প্রয়োগমূলক : শিক্ষার্থীরা বলতে পারবে ভারতে কোন ধরনের শাসনব্যবস্থা আছে।

দক্ষতামূলক : শিক্ষার্থীরা এককেন্দ্রিক সরকারের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যাবলী লিখে একটি তালিকা তৈরী করতে পারবে।

- **Selection of Teaching Strategies :**

শিক্ষিকা মহাশয়া এককেন্দ্রিক সরকারের সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য বক্তৃতা পদ্ধতির মাধ্যমে উপস্থাপন করবেন এবং দোষ ও গুণগুলি আলোচনা পদ্ধতির মাধ্যমে উপস্থাপন করবেন। শিক্ষা সহায়ক উপকরণ হিসেবে মডেল, চার্ট, রোলবোর্ড এমনকি মানচিত্রও প্রয়োজন মত ব্যবহার করবেন এবং যথাযথভাবে ব্ল্যাকবোর্ড ব্যবহার করবেন।

- **Selection of Teaching Aids with note on their preparation and Mode of Use :**

(ক) শিক্ষিকা মহাশয়া এককেন্দ্রিক সরকারের বৈশিষ্ট্যাবলী রোলবোর্ডের মাধ্যমে দেখাতে পারবেন।

(খ) এককেন্দ্রিক সরকারের গুণ ও ত্রুটিগুলি চার্টের মাধ্যমে দেখাবেন।

- **Questioning with Reference to specific Objectives :**

১) এককেন্দ্রিক সরকার কাকে বলে? (জ্ঞানমূলক)

২) এককেন্দ্রিক সরকারের দুটি গুণ উল্লেখ করো। (জ্ঞানমূলক)

৩) এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থায় বিচার বিভাগ দুর্বল হয় কেন? (বোধমূলক)

৪) ভারতে এককেন্দ্রিক না যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার? (প্রয়োগমূলক)

৫) এককেন্দ্রিক সরকারের গুণ ও ত্রুটিগুলি নিয়ে একটি তালিকা তৈরী করো। (দক্ষতামূলক)

Criterion Referenced Test

উপ-একক	উদ্দেশ্য	প্রশ্নের নং	প্রশ্নের মান	মোট	শতকরা
এককেন্দ্রীক সরকারের সংজ্ঞা বৈশিষ্ট্য গুণ ও ত্রুটি	জ্ঞানমূলক	১,২	১+২	৩	৩০%
	বোধমূলক	৩	৩	৩	৩০%
	প্রয়োগমূলক	৪	২	২	২০%
	দক্ষতামূলক	৫	২	২	২০%
				১০	**১০০%**

২.৪.৩ ● শিক্ষাতাত্ত্বিক পাঠ বিশ্লেষণ - ৩ (Pedagogical Analysis No - 3)

Identification of Units and Sub-units

একক	উপ-একক	পিরিয়ড সংখ্যা	মোট পিরিয়ড
একনায়কতন্ত্র ও গণতন্ত্র	(ক) গণতন্ত্র ও তার প্রকারভেদ	২	
	*(খ) একনায়কতন্ত্র ও তার প্রকারভেদ	২	৬
	(গ) গণতন্ত্র ও একনায়কতন্ত্রের মধ্যে পার্থক্য	২	

*চিহ্নিত উপ-এককটি বিশ্লেষণ করা হল।

- **Summerization of the Essence of Each Unit :**

একনায়কতন্ত্র গণতন্ত্রের বিপরীত শাসনব্যবস্থা। রাষ্ট্রবিজ্ঞানী 'নিউম্যান'-এর মতে যখন একজন বা কয়েকজন ব্যক্তি রাষ্ট্রের যাবতীয় ক্ষমতা হস্তগত করে অপ্রতিহতভাবে প্রয়োগ করে তখন সেই শাসনব্যবস্থাকে আমরা একনায়কতন্ত্র বলে অভিহিত করি। আবার রাষ্ট্রবিজ্ঞানী অস্টিন বেনী একনায়কতন্ত্র বলতে ''One man or a small elite" অর্থাৎ একজন বা একটি ক্ষুদ্র প্রবর গোষ্ঠীর হাতে ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত থাকলে একনায়কতন্ত্রের জন্ম হয়।

প্রকারভেদ : একনায়কতন্ত্র মূলত তিন প্রকার। (1) ব্যক্তিগত : যখন একজন ব্যক্তি বা সামরিক নেতার হাতে দেশের ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত থাকে তখন তাকে ব্যক্তিগত একনায়কতন্ত্র বলা হয়। (2) দলগত : যখন একটি দলের হাতে রাষ্ট্রের ক্ষমতা অন্য কোন দেশের অস্তিত্ব থাকে না তাকে দলগত একনায়কতন্ত্র বলা হয়। (3) শ্রেণীগত : শ্রেণীগত একনায়কতন্ত্র বলতে একটি বিশেষ শ্রেণীর একনায়কতন্ত্র বোঝায়।

- **Sequence and Resequence of the Unit :**

আমি যে অধ্যায়ের একক বিন্যাস করতে চলেছি সেই অধ্যায়ের নাম হল গণতন্ত্র ও একনায়কতন্ত্র। তার বিভিন্ন একক বিন্যাস হল -

- গণতন্ত্র ও তার প্রকারভেদ
- একনায়কতন্ত্র ও তার প্রকারভেদ
- গণতন্ত্র ও একনায়কতন্ত্রের মধ্যে পার্থক্য।

একনায়কতন্ত্রের উপ-একক বিন্যাস হল -

- একনায়কতন্ত্রের সংজ্ঞা।
- একনায়কতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য।
- একনায়কতন্ত্রের গুরুত্ব।

- **Specification of Instructional Objectives :**

শিক্ষক মহাশয়ের একনায়কতন্ত্র সম্পর্কিত শিক্ষাদান শিক্ষার্থীর জ্ঞানমূলক, বোধমূলক, প্রয়োগমূলক ও দক্ষতামূলক সামর্থ্য ও উদ্দেশ্য বিকাশ সাধন করে।

জ্ঞানমূলক : শিক্ষার্থীরা একনায়কতন্ত্রের দোষ ও গুণ ও তার অর্থ সম্পর্কে জানতে পারবে।

বোধমূলক : শিক্ষার্থীরা একনায়কতন্ত্রের দোষ ও গুণগুলি ব্যাখ্যা করতে পারবে।

প্রয়োগমূলক : শিক্ষার্থীরা একনায়কতন্ত্রের বিশ্ব শান্তির পরিপন্থী বলার কারণ বিশ্লেষণ করতে পারবে।

দক্ষতামূলক : একনায়কতন্ত্রের প্রকারভেদগুলির তালিকা তৈরী করতে পারবে।

- **Selection of Teaching Strategies :**

একনায়কতন্ত্রের সংজ্ঞা ও বিজ্ঞানীদের মতামত বক্তৃতা পদ্ধতি এবং একনায়কতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য আলোচনা পদ্ধতির মাধ্যমে উপস্থাপন করা হবে। একনায়কতন্ত্রের প্রকারভেদগুলির একটি তালিকাকারে উপস্থাপন করা হবে। কোন কোন দেশে একনায়কতন্ত্র বিদ্যমান সেই দেশের নাম উদাহরণ হিসাবে বোর্ডে শিক্ষক মহাশয় লিখবেন এবং পৃথিবীর মানচিত্রে সেগুলি দেখাবেন।

- **Selection of Teaching Aids with note on their preparation and Mode of Use :**

(ক) শিক্ষক মহাশয় একনায়কতন্ত্রের প্রকারভেদগুলি বোর্ডের মাধ্যমে দেখাতে পারবেন।

(খ) একনায়কতন্ত্রের শাসন প্রণালী একটি চার্টের মাধ্যমে দেখাবেন।

(গ) পৃথিবীর মানচিত্র ও পয়েন্টিং স্টিক ব্যবহার করবেন।

- **Questioning with Reference to specific Objectives :**

১) একনায়কতন্ত্রের সংজ্ঞা দাও ও তার প্রকারভেদগুলি কী কী? (জ্ঞানমূলক)

২) একনায়কতন্ত্রের দোষ ও গুণগুলি বিচার কর। (জ্ঞানমূলক)

৩) একনায়কতন্ত্রকে নৈতিকতা বিরোধী বলার কারণ বিশ্লেষণ কর। (বোধমূলক)

৪) মানচিত্রের সাহায্যে কোন কোন দেশে একনায়কতন্ত্র বিদ্যমান সেগুলি উল্লেখ করে দেখাও। (দক্ষতামূলক)

Criterion Referenced Test

উপ-একক	উদ্দেশ্য	প্রশ্নের নং	প্রশ্নের মান	মোট	শতকরা
একনায়কতন্ত্রের সংজ্ঞা	জ্ঞানমূলক	১,২	২+১	৩	৩০%
	বোধমূলক	৩	২	২	২০%
একনায়কতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য	প্রয়োগমূলক	৪	৩	৩	৩০%
একনায়কতন্ত্রের গুরুত্ব	দক্ষতামূলক	৫	২	২	২০%
				১০	**১০০%**

২.৪.৪ ● শিক্ষাতাত্ত্বিক পাঠ বিশ্লেষণ - ৪ (Pedagogical Analysis No - 4)

Identification of Units and Sub-units

একক	উপ-একক	পিরিয়ড সংখ্যা	মোট পিরিয়ড
রাষ্ট্রের উৎপত্তি বিষয়ক মতবাদসমূহ	(ক) ঐশ্বরিক উৎপত্তিবাদ	২	
	*(খ) বলপ্রয়োগ মতবাদ	২	৮
	(গ) সামাজিক চুক্তি মতবাদ	২	
	(ঘ) বিবর্তনমূলক বা ঐতিহাসিক মতবাদ	২	

*চিহ্নিত উপ-এককটি বিশ্লেষণ করা হল।

- **Summerization of the Essence of Each Unit :**

রাষ্ট্রের উৎপত্তি বিষয়ক বিভিন্ন মতবাদের মধ্যে অন্যতম হল বলপ্রয়োগের মতবাদ। এই মতানুসারে বল বা শক্তি প্রয়োগের মধ্য দিয়েই রাষ্ট্রের উৎপত্তি ঘটেছে এবং বলপ্রয়োগই হল রাষ্ট্রের ভিত্তি। মানুষ

ক্ষমতালিপ্সু ও কলহপ্রিয়। প্রাচীনকাল মানব সমাজ বিভিন্ন দল, গোষ্ঠী নানা উপজাতিতে বিভক্ত ছিল। খাদ্যবস্তু সংস্থান, গৃহ নির্মাণের জন্য উপযুক্ত স্থান নির্বাচনের জন্য প্রায়ই এক গোষ্ঠীর সঙ্গে অন্য গোষ্ঠীর সংঘর্ষ লাগত। যে গোষ্ঠী বিজয়ী হতো তারা আধিপত্য বিস্তার করত। এইভাবে কতকগুলি বা গোষ্ঠী যখন একজন শক্তিশালী একজন দলপতি বা গোষ্ঠীপতির নিকট আনুগত্য প্রকাশ করত তখন উদ্ভব ঘটে রাষ্ট্রের। এ বিষয়ে ফরাসী দার্শনিক ভানটেয়ার বলেছেন 'প্রথম রাজা ছিলেন একজন ভাগ্যবান যোদ্ধা'। জেঙ্কস তার বিখ্যাত গ্রন্থ 'A short history of politics' -এ রাষ্ট্রের উৎপত্তি কীভাবে ঘটেছে তার একটি চিত্র অঙ্কন করেছেন। ওপেনহাইমার বলেন রাষ্ট্র হল বিজয়ীর বলপ্রয়োগের দ্বারা বিজিতের ওপর প্রতিষ্ঠিত এক সামাজিক প্রতিষ্ঠান।

এই মতবাদের সমালোচনা :

ক) বলপ্রয়োগ রাষ্ট্রের ভিত্তি নয়।

খ) বলপ্রয়োগ রাষ্ট্র গঠনের একমাত্র উপাদান নয়।

গ) অগণতান্ত্রিক মতবাদ।

গুরুত্ব :

ক) সমাজবিকাশের একটি স্তরে বলপ্রয়োগ রাষ্ট্রের উৎপত্তিতে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল।

খ) অতীতের মত বর্তমান রাষ্ট্রগুলি অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য বলপ্রয়োগ করে।

গ) সমাজ পরিবর্তনের ক্ষেত্রে বলপ্রয়োগের ঐতিহাসিক ভূমিকা আজও সর্বজনস্বীকৃত।

Sequence and Resequence of the Unit :

আমি যে অধ্যায়ের একক বিন্যাস করতে চলেছি সেই অধ্যায়ের নাম হল রাষ্ট্রের উৎপত্তি বিষয়ক মতবাদসমূহ। তার বিভিন্ন একক বিন্যাস হল —

- ঐশ্বরিক উৎপত্তি মতবাদ।
- বলপ্রয়োগ মতবাদ।
- সামাজিক চুক্তি মতবাদ।
- বিবর্তনমূলক বা ঐতিহাসিক মতবাদ।

বলপ্রয়োগ মতবাদের উপ-একক বিন্যাস হল —

- বলপ্রয়োগের দ্বারা রাষ্ট্রের উৎপত্তি।
- বলপ্রয়োগ মতবাদের সমালোচনা।
- বলপ্রয়োগ মতবাদের গুরুত্ব।

Specification of Instructional Objectives :

শিক্ষক মহাশয় বলপ্রয়োগ মতবাদ সম্পর্কিত শিক্ষাদান শিক্ষার্থীর জ্ঞানমূলক, বোধমূলক, প্রয়োগমূলক ও দক্ষতামূলক সামর্থ্য ও উদ্দেশ্যকে বিকাশ সাধন করে।

জ্ঞানমূলক : রাষ্ট্রের উৎপত্তি বিষয়ে বলপ্রয়োগের মতবাদটি সম্পর্কে জানতে পারবে।

বোধমূলক : শিক্ষার্থীরা বলপ্রয়োগ মতবাদটি ব্যাখ্যা করতে পারবে।

প্রয়োগমূলক : রাষ্ট্রের উৎপত্তি বিষয়ক বলপ্রয়োগ মতবাদটির গুরুত্ব নির্ণয় করতে পারবে।

দক্ষতামূলক : শিক্ষার্থীরা বলপ্রয়োগ মতবাদটির গুরুত্বগুলির একটি তালিকা তৈরী করতে পারবে।

Selection of Teaching Strategies :

বলপ্রয়োগ মতবাদটির সম্পর্কে ব্যাখ্যা ও সমালোচনা, বক্তৃতা পদ্ধতি এবং বলপ্রয়োগ মতবাদটির গুরুত্ব আলোচনা পদ্ধতির মাধ্যমে উপস্থাপন করা হবে। এই মতবাদটির গুরুত্ব ও সমালোচনাগুলো একটি তালিকা করে উপস্থাপন করা হবে। রাষ্ট্রের উৎপত্তি হিসাবে বিভিন্ন দার্শনিকের মতামত শিক্ষিকা মহাশয়া বোর্ডে লিখবেন এবং উদাহরণের সাহায্যে বোঝা বিষয়বস্তু বোঝাবেন।

Selection of Teaching Aids with note on their preparation and Mode of Use :

(ক) শিক্ষিকা মহাশয়া রাষ্ট্রের উৎপত্তি বিষয়ে বলপ্রয়োগ মতবাদটি সম্পর্কে বিভিন্ন রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মতবাদ রোলবোর্ডের মাধ্যমে দেখাবেন।

(খ) এই মতবাদের গুরুত্ব চার্টের মাধ্যমে দেখাবেন।

Questioning with Reference to specific Objectives :

১) রাষ্ট্রের উৎপত্তি বিষয়ে বলপ্রয়োগ মতবাদ সম্পর্কে মতবাদ দিয়েছেন একজন দুজন রাষ্ট্রবিজ্ঞানীর নাম কী কী? (জ্ঞানমূলক)

২) এই মতবাদের দুটি সমালোচনা লেখ। (বোধমূলক)

৩) এই মতবাদের তিনটি গুরুত্ব বিশ্লেষণ কর। (প্রয়োগমূলক)

৪) এই মতবাদ বিষয়ে কয়েকজন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ও তাঁদের মতামতের চার্ট তৈরী করো। (দক্ষতামূলক)

Criterion Referenced Test

উপ-একক	উদ্দেশ্য	প্রশ্নের নং	প্রশ্নের মান	মোট	শতকরা
বলপ্রয়োগের দ্বারা রাষ্ট্রের উৎপত্তি	জ্ঞানমূলক	১	২	১	২০%
	বোধমূলক	২	২	২	২০%
বলপ্রয়োগ মতবাদের সমালোচনা	প্রয়োগমূলক	৩	৩	৩	৩০%
বলপ্রয়োগ মতবাদের গুরুত্ব	দক্ষতামূলক	৪	৩	৩	৩০%
				১০	১০০%

২.৪.৫ সিক্ষাতাত্ত্বিক পাঠ-বিশ্লেষণ - ৫ (Pedagogical Analysis No - 5)

Identification of Units and Sub-units

একক	উপ-একক	পিরিয়ড সংখ্যা	মোট পিরিয়ড
ভারতের কেন্দ্রীয় শাসনবিভাগ	(ক) রাষ্ট্রপতি	২	
	(খ) উপরাষ্ট্রপতি	২	৬
	*(গ) প্রধানমন্ত্রী	২	

* চিহ্নিত উপ-এককটি বিশ্লেষণ করা হল।

Summerization of the Essence of Each Unit :

অন্যান্য সংসদীয় শাসনব্যবস্থার মতো ভারতীয় ব্যবস্থাতেও প্রধানমন্ত্রী হলেন শাসনব্যবস্থার প্রধান। সংবিধানের ৭৪(১) ধারার নির্দেশে এই যে, রাষ্ট্রপতিকে সহায়তা ও পরামর্শ দেওয়ার জন্য একটি মন্ত্রী পরিষদ থাকবে যার শীর্ষে থাকবেন প্রধানমন্ত্রী। প্রধানমন্ত্রী পাঁচ বছরে জন্য নিযুক্ত হন। প্রধানমন্ত্রী দলের প্রধান হিসাবে দলের এক দেশের প্রধান হিসাবে দেশের উভয় দিকেই নেতৃত্ব প্রদান করতে হয়। সুতরাং পদ মর্যাদাগত দিক সর্বোচ্চ স্থানে অবস্থান করেছেন। প্রধানমন্ত্রী কার্যগত দিক থেকে রাষ্ট্রপতিকে কার্য পরিচালনার জন্য পরামর্শ প্রদান করতে থাকেন। মন্ত্রী পরিষদের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে তাদের কার্য বন্টন করে থাকেন। আইন বিভাগের কার্য পরিচালনা করেন, দলীয় নেতা হিসাবে তার দলের কার্য পরিচালনা ও দপ্তরও সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন থাকেন।

Sequence and Resequence of the Unit :

আমি যে অধ্যায়ের একক বিন্যাস করতে চলেছি সেই অধ্যায়ের নাম হল ভারতের কেন্দ্রীয় শাসনবিভাগ। তার বিভিন্ন একক বিন্যাস হল —

- রাষ্ট্রপতি
- উপরাষ্ট্রপতি
- প্রধানমন্ত্রী

প্রধানমন্ত্রীর উপ-একক বিন্যাস হল —

- সাংবিধানিক ভূমিকা
- যোগ্যতা, নিয়োগ ও অপসারণ
- ক্ষমতা ও কার্যাবলী

Specification of Instructional Objectives :

শিক্ষক মহাশয়ের প্রধানমন্ত্রী সম্পর্কিত শিক্ষাদান শিক্ষার্থীর জ্ঞানমূলক, বোধমূলক, প্রয়োগমূলক ও দক্ষতামূলক সামর্থ্য ও উদ্দেশ্যে বিকাশ সাধন করবে।

জ্ঞানমূলক : শিক্ষার্থীরা প্রধানমন্ত্রীর সাংবিধানিক গুরুত্ব সম্পর্কে জানবে ও বলতে পারবে।

বোধমূলক : শিক্ষার্থীরা প্রধানমন্ত্রীর যোগ্যতা ও অপসারণ সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারবে।

প্রয়োগমূলক : শিক্ষার্থীরা দেশের মধ্যে প্রধানমন্ত্রীর গুরুত্ব ও পদমর্যাদা উপলব্ধি করতে পারবে।

দক্ষতামূলক : শিক্ষার্থীরা প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা ও কার্যাবলী লিখে একটি তালিকা তৈরী করতে পারবে।

Selection of Teaching Strategies :

শিক্ষক মহাশয় প্রধানমন্ত্রীর সাংবিধানিক ভূমিকা বক্তৃতা পদ্ধতির মাধ্যমে উপস্থাপন করবেন এবং তার যোগ্যতা, নিয়োগ ও অপসারণের মাধ্যম আলোচনার মাধ্যমে উপস্থাপন করবেন। শিক্ষা সহায়ক উপকরণ হিসাবে মডেল, চার্ট এমনকি পার্লামেন্টের চিত্র ব্যবহার করবেন।

Selection of Teaching Aids with note on their preparation and Mode of Use :

(ক) শিক্ষক মহাশয় প্রধানমন্ত্রীর যোগ্যতাগুলি রোলবোর্ডের মাধ্যমে দেখাতে পারবেন।

(খ) প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা ও কার্যাবলী চার্টের মাধ্যমে দেখাবেন।

(গ) ভারতীয় পার্লামেন্ট ভবনের চিত্র দেখাবেন।

Questioning with Reference to specific Objectives :

১) প্রধানমন্ত্রীর হবার জন্য কী কী যোগ্যতা দরকার? (জ্ঞানমূলক)

২) প্রধানমন্ত্রী কার দ্বারা কয় বছরের জন্য নিযুক্ত হন? (জ্ঞানমূলক)

৩) প্রধানমন্ত্রীই কী ভারতের প্রকৃত শাসক? (প্রয়োগমূলক)

৪) প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা ও কার্যাবলীর একটি তালিকা তৈরী করো। (দক্ষতামূলক)

৫) প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে আইন সভার সম্পর্ক কি? (বোধমূলক)

Criterion Referenced Test

উপ-একক	উদ্দেশ্য	প্রশ্নের নং	প্রশ্নের মান	মোট	শতকরা
প্রধানমন্ত্রীর সাংবিধানিক ভূমিকা, যোগ্যতা নিয়োগ ও অপসারণ ক্ষমতা ও কার্যাবলী	জ্ঞানমূলক	১,২	১+২	৩	৩০%
	বোধমূলক	৫	২	২	২০%
	প্রয়োগমূলক	৩	২	২	২০%
	দক্ষতামূলক	৪	৩	৩	৩০%
				১০	**১০০%**

২.৫ সারসংক্ষেপ (Summary)

বর্তমানে আধুনিক শিশুকেন্দ্রীক শিক্ষা ব্যবস্থার অন্যতম বিষয় হল শিক্ষাতাত্ত্বিক পাঠ বিশ্লেষণ বা Pedagogical Analysis। গ্রিক পেডাগলজিও (Pedagogio) শব্দ থেকে পেডাগজি (Pedagogy) শব্দটির

উৎপত্তি হয়েছে। Pedagogy শব্দটি গ্রিক শব্দ Pedia ও Goges থেকে এসেছে। Pedia শব্দটির অর্থ হল শিশু এবং Goges শব্দটির অর্থ হল জ্ঞান। ফ্রয়বেল, ডিউই, পিঁয়াজে, ওয়াটকিন্স, কোমেন্সকি, বি. এস. ব্লুম প্রমুখ এই তত্ত্বটি নির্মাণে সাহায্য করেছেন। তবে পেডাগজি সংক্রান্ত আলোচনার প্রাণকেন্দ্র হিসাবে অধ্যাপক ব্লুম এর Taxonomy তত্ত্বটি অনুসরণ করে থাকি।

২.৬ গ্রন্থপঞ্জী (References)

১) প্রামাণিক, নিমাই, রাষ্ট্রবিজ্ঞানের রূপরেখা, ছায়া প্রকাশনী, মার্চ - ২০০৫।

২) দালাল, প্রণব কুমার, রাষ্ট্রবিজ্ঞান সমগ্র, আরামবাগ বুক হাউস।

৩) মুখোপাধ্যায়, অমল কুমার উচ্চমাধ্যমিক রাষ্ট্রবিজ্ঞান, শ্রীধর পাবলিশার্স।

৪) সিংহ, দেবব্রত, উচ্চমাধ্যমিক রাষ্ট্রবিজ্ঞান শিক্ষক, ছায়া প্রকাশনী।

৫) দত্ত, মৃণালকান্তি, উচ্চমাধ্যমিক রাষ্ট্রবিজ্ঞান সমগ্র, এ.বি.এস পাবলিশিং হাউস।

৬) মজুমদার, স্মৃতিকণা, রাষ্ট্রবিজ্ঞান শিক্ষণ পদ্ধতি, রীতা পাবলিকেশন।

৭) হালদার, শ্রী গৌরদাস, শিক্ষা প্রসঙ্গে অর্থনীতি ও পৌরবিজ্ঞান, ব্যানার্জী পাবলিশার্স।

২.৭ প্রশ্নাবলী (Self Checked Questions)

১. পেডাগজি শব্দটি কোথা থেকে এসেছে?

২. পেডাগজি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাও।

৩. রাষ্ট্রপতি এককটির শিক্ষা সংক্রান্ত বিশ্লেষণ কর।

৪. নির্দেশ অনুযায়ী যে কোন একটি এককের বিশ্লেষণ করুন সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ / ভারতের বিচার ব্যবস্থা / পশ্চিমবঙ্গের স্থানীয় স্বায়ত্ত্ব শাসন ব্যবস্থা (B.Ed Exam - 2013)

   i) উপ-এককে বিশ্লেষণ করুন ও একটি উপ-একক নির্বাচন করুন।

   ii) উপ-একটির উদ্দেশ্যাবলী নির্দেশ করুন।

   iii) ছয়টি উদ্দেশ্য সমন্বিত প্রশ্ন প্রস্তুত করুন।

৫. নির্দেশ অনুযায়ী যে কোন একটি বিষয় বিশ্লেষণ করুন — জাতীয় জনসমাজের উপাদানসমূহ/সাধারণ সভা/ভারতীয় পার্লামেন্টের কার্যাবলী (B.Ed Exam - 2014)

(i) একক ও উপ-একক চিহ্নিত করুন।

(ii) উপ-এককটির সারমর্ম লিখুন।

(iii) উপ-এককটিকে পুনঃপর্যায়ক্রমিকভাবে ভাগ করুন।

(iv) উপ-এককটিকে শিক্ষণের উদ্দেশ্যাবলী নির্দিষ্ট করুন।

(v) শিক্ষণ কৌশল নির্দেশ করুন (শিক্ষা সহায়ক উপকরণের ব্যবহার, কৃষ্ণ ফলকের ব্যবহার)

(vi) বিশদ ছক প্রস্তুত করুন।

(vii) বিশদ ছক অনুযায়ী বিশেষ উদ্দেশ্য সমন্বিত আটটি প্রশ্ন করুন।

একক ৩

রাষ্ট্রবিজ্ঞান শিক্ষণের পদ্ধতি

(Methodology of Teaching Political Science)

এককের গঠন বিন্যাস (Structure)

৩.১ উদ্দেশ্য

৩.২ সূচনা

৩.৩ বিদ্যালয়ে পাঠক্রমে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের স্থান

৩.৪ রাষ্ট্রবিজ্ঞান পাঠের প্রয়োজনীয়তা

৩.৫ রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে সম্পর্ক

- ৩.৫.১ রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও ইতিহাসের সম্পর্ক
- ৩.৫.২ রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও অর্থনীতির সম্পর্ক
- ৩.৫.৩ রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও সমাজবিদ্যার সম্পর্ক
- ৩.৫.৪ রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও ভূগোলের সম্পর্ক

৩.৬ রাষ্ট্রবিজ্ঞান শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

৩.৭ সারসংক্ষেপ

৩.৮ গ্রন্থপঞ্জী

৩.৯ প্রশ্নাবলী

একক ৩

রাষ্ট্রবিজ্ঞান শিক্ষণের পদ্ধতি

(Methodology of Teaching Political Science)

৩.১ উদ্দেশ্য (Objective)

এই এককটি পাঠ করে শিক্ষার্থীরা —

- ★ বিদ্যালয় পাঠক্রমে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের স্থান কোথায় তা বর্ণনা করতে পারবেন।
- ★ উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে রাষ্ট্রবিজ্ঞান পাঠের পক্ষে কি কি যুক্ত আছে তা বিশ্লেষণ করতে পারবেন।
- ★ রাষ্ট্রবিজ্ঞান পাঠের প্রয়োজনীয়তাগুলি উপলব্ধি করতে পারবেন।
- ★ রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও ইতিহাসের সম্পর্ক বর্ণনা করতে পারবেন।
- ★ রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও অর্থনীতির মধ্যে কি সম্পর্ক তা জানতে পারবেন।
- ★ রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও সমাজবিদ্যার সম্পর্ক বর্ণনা করতে পারবেন।
- ★ রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও ভূগোলের মধ্যে সম্পর্ক বর্ণনা করতে পারবেন।
- ★ রাষ্ট্রবিজ্ঞান পাঠের লক্ষ্যগুলি সম্পর্কে জানতে পারবেন।

৩.২ সূচনা (Introduction)

সাধারণভাবে বলা যেতে 'শিক্ষণ পদ্ধতি হল এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে শিক্ষক বিষয়বস্তুও সঙ্গে শিক্ষার্থীর সংযোগ স্থাপন করেন'। শ্রেণীকক্ষের পঠন-পাঠন-কার্যক্রম পরিচালনার উদ্দেশ্যে শিক্ষকেরা উপযুক্ত শিক্ষণ পদ্ধতির মাধ্যমে শিক্ষার্থীর মনোযোগ, আগ্রহ, প্রেরণা ইত্যাদি নিয়ন্ত্রিত করে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা বিকাশে সাহায্য করার চেষ্টা করেন। তাই আধুনিককালে বিজ্ঞানসম্মত শিক্ষণ পদ্ধতি শিখনের মনোবৈজ্ঞানিক ভিত্তি, সমাজতাত্ত্বিক ভিত্তি ইত্যাদি বিষয়ের উপর জোর দিতে হবে। এই সমস্ত উপাদানের ভিত্তিতে বিষয়ভিত্তিক ও ব্যক্তিকেন্দ্রিক শিক্ষণ প্রক্রিয়া পরিচালনা করার প্রয়োজন। উপযুক্ত শিক্ষককে তখন 'বিষয়বস্তু' ও 'ব্যক্তি' এই দুই-এর কথা মাথায় রেখে শিক্ষণ পদ্ধতি নির্বাচন ও পরিচালনা করতে হয়।

আর এই রাষ্ট্রবিজ্ঞানের মত জীবনকেন্দ্রিক ও বাস্তবসম্মত বিষয় আজ বিদ্যালয়ের পাঠক্রমে চালু হলে শিক্ষার্থীদের সর্বাঙ্গীন বিকাশ সম্ভব। আধুনিক ও উন্নত কৌশলের সাহায্যে শিক্ষার্থীকে আকর্ষিত করবে রাষ্ট্রবিজ্ঞান। গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় ও বাস্তবজীবনে অতি প্রয়োজনীয় বিষয় হল রাষ্ট্রবিজ্ঞান। এটি সমাজবিজ্ঞানের অন্যান্য বিষয়গুলি সমৃদ্ধ করতে ও বুঝতে সাহায্য করে। এটি মানবসমাজকে তার রাজনৈতিক লক্ষ্যে পৌছাতে সাহায্য করে।

৩.৩ বিদ্যালয় পাঠক্রমে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের স্থান (Place of Political Science in School Curriculum)

শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য শিক্ষার্থীর সার্বিক বিকাশ সাধন। মানবজীবনের চিন্তা ও কর্মের অনেকটাই আবর্তিত হয় রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে কেন্দ্র করে। শিক্ষার্থীর সার্বিক বিকাশ সাধন করতে হলে এবং তাকে সময় উপযোগী বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন ঘটনাবহুল জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অবস্থা সম্পর্কে চেতনা সম্পন্ন সুনাগরিক করে গড়ে তুলতে হলে রাষ্ট্রবিজ্ঞান অবশ্যই পাঠক্রমে অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন।

অতীতে পাঠক্রম রচিত হত সমাজের বয়স্ক ব্যক্তিদের ইচ্ছা-অনিচ্ছা বা সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গির ওপর ভিত্তি করে। যে কোনো ভাবে শিক্ষার্থীর মস্তিষ্কে কিছু জ্ঞানের বোঝা চাপিয়ে দেওয়াই ছিল প্রচলিত পাঠক্রমের উদ্দেশ্য। কিন্তু বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থা মনোবিজ্ঞানভিত্তিক। শিক্ষা ক্ষেত্রে এখন শিক্ষার্থীরাই প্রধান। একদিকে ব্যক্তি চাহিদা, তার রুচি, সামর্থ্য, আগ্রহ অন্যদিকে সমাজের দাবি, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পটভূমি-এর সবকিছুর প্রতিফলনই থাকতে হবে পাঠক্রমের মধ্যে। মুদালিয়র কমিশন ব্যক্তি চাহিদার সঙ্গে সামাজিক চাহিদা সংযুক্ত করতে চেয়েছিলেন।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে বোঝা যায় রাষ্ট্রবিজ্ঞান পাঠের গুরুত্ব অনেক বেশি। বর্তমান শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থায়, শিক্ষার্থীর বাস্তবিক চেতনা বৃদ্ধির উপর গুরুত্ব দিয়ে উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে রাষ্ট্রবিজ্ঞান পাঠের পক্ষে যে যুক্তিগুলি দেওয়া যায় তা নিম্নে আলোচনা করা হল—

(১) **মনস্তাত্ত্বিক যুক্তি :** মনোবিজ্ঞানীদের মতে উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে পাঠরত শিক্ষার্থীদের বয়স ১৫-১৭ বছর অর্থাৎ বয়ঃসন্ধিকাল। এই সময় তাদের বুদ্ধির বিকাশ খুব দ্রুত হয়। এই সময় তাদের যুক্তি, বিশ্লেষণের ক্ষমতা ও বিচারযোগ্যতা বৃদ্ধি পায়। তাই এই স্তরে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের মত বিশ্লেষণাত্মক ও বাস্তব জীবন সম্পর্কিত বিষয় পাঠ দান অবশ্যই প্রয়োজন। যে ধারণা, দৃষ্টিভঙ্গি ও অভিজ্ঞতা সৃষ্টি করা যায় পরবর্তী জীবনে তার প্রভাব সবচেয়ে বেশি পড়ে।

(২) **সুনাগরিক গঠনের যুক্তি :** রাষ্ট্রবিজ্ঞান শিক্ষা উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে চালু করার প্রধান যুক্তি হল সুনাগরিক তৈরী। কারণ এই বয়সের শিক্ষার্থীরা ১৮ বছর বয়সের পর ভোটাধিকার প্রয়োগ যেমন করবে, তেমনি সুনাগরিক হয়ে নিজেদের দায়িত্ব পালনও করবে। আর এই সুশৃঙ্খল ও সুন্দর সমাজব্যবস্থা গড়ে তুলতে নিজেদের দায়িত্ব ও কর্তৃত্ব পালন করতে শিখবে রাষ্ট্রবিজ্ঞান শিক্ষণের মাধ্যমে। নিজেদের রাজনৈতিক ও সামাজিক গুণাবলীর বিকাশ ঘটাবে রাষ্ট্রবিজ্ঞান শিক্ষার সাহায্যে।

(৩) **বাস্তব জ্ঞানের বিকাশের যুক্তি :** রাষ্ট্রবিজ্ঞান পাঠের সাহায্যে শিক্ষার্থীদের সমাজ, রাষ্ট্র প্রশাসন, রাজনীতি সম্পর্কে যে ধারণা লাভ করে তার সঙ্গে বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতার মেল বন্ধন ঘটায় এবং ভবিষ্যৎ জীবনে নিজেদের চলার পথকে সহজ করে। তাই উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে রাষ্ট্রবিজ্ঞান শিক্ষা জরুরী।

(৪) **জাতীয় প্রয়োজনভিত্তিক যুক্তি :** স্বাধীনতার পরবর্তীকালের কমিশন ও শিক্ষানীতিগুলিতে কিছু জাতীয় সমস্যার কথা বলেছিলেন। যেমন— বেকার সমস্যা, নারীশিক্ষার সমস্যা, জাতীয় সংহতির সমস্যা এবং রাষ্ট্রনৈতিক উন্নয়নের সমস্যা। গতানুগতিক শিক্ষার পাঠক্রমে শিক্ষার ব্যবহারিক দিকের

ওপর এবং দক্ষতা অর্জন ও প্রয়োগের ওপর কোনো গুরুত্ব না দেওয়ায় বেকার সমস্যা দ্রুত বাড়ছে। তাই রাষ্ট্রবিজ্ঞানের মত বাস্তবধর্মী ও প্রয়োজনভিত্তিক বিষয়বস্তু অবশ্যই পাঠক্রমে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

(৫) **সামাজিক মূল্যের বিকাশের যুক্তি :** উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষার পর অনেক সময় দেখা যায়, ছেলেমেয়েরা উচ্চশিক্ষার দিকে না গিয়ে সমাজজীবনে প্রবেশ করে। সুতরাং এই স্তরের পাঠক্রমে এমন বিষয়বস্তু থাকতে হবে যা তাদের ভবিষ্যতে সামাজিক দায়িত্ব পালনে সক্ষম করে তোলে।

সমাজস্থ বিভিন্ন সংস্থাগুলির প্রধান লক্ষ্য হল ব্যক্তির সামগ্রিক কল্যাণসাধন আর এই কল্যাণসাধন তখনই সম্ভব যখন দেশে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা থাকবে। আর এই রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা আনতে হলে দেশের জনগণের রাষ্ট্রনীতি সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা থাকতে হবে। সুতরাং রাষ্ট্রবিজ্ঞান উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে অবশ্যই পাঠ্যবিষয় হওয়া উচিত।

(৬) **সাংস্কৃতিক মূল্য :** রাষ্ট্রবিজ্ঞান পাঠের সাংস্কৃতিক মূল্যও কম নয়। এ প্রসঙ্গে ডঃ সর্বপল্লি রাধাকৃষ্ণান বলেছিলেন, ''যাযাবরেরা উন্নত মানের সংস্কৃতিসম্পন্ন হতে পারে না''। তাঁর মতে স্থিতিশীল সুশৃঙ্খল সমাজব্যবস্থা ও একটি নিরাপদ আশ্রয় দিতে পারে একটি সৃজনশীল পরিবেশ যা মানুষকে নতুন নতুন ও উন্নত মানের শিল্পকলা সৃষ্টি ও বিজ্ঞান চর্চায় উৎসাহিত করতে পারে এবং প্রতিটি মানুষকে চিন্তাশীল, গণতন্ত্রে বিশ্বাসী সুনাগরিক ও উৎপাদনশীল জীব হিসাবে গড়ে তুলতে পারে। এরাই আবার ভবিষ্যতে উন্নততর সমাজব্যবস্থা স্থাপন করতে পারে।

(৭) **সামাজিক গুণের বিকাশ :** রাষ্ট্রবিজ্ঞান পাঠের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের ধৈর্য্য, সহানুভূতি, আত্মনিয়ন্ত্রণ, সহিষ্ণুতা, রাষ্ট্রনৈতিক, শৃঙ্খলাবোধ, আত্মসম্মানবোধ, চারিত্রিক দৃঢ়তা, জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতাবোধ জাগ্রত করতে সাহায্য করে। এই সকল কারণে রাষ্ট্রবিজ্ঞান পাঠের উপযোগিতা ও মূল্য অনস্বীকার্য।

(৮) **ঐতিহাসিক মূল্য :** রাষ্ট্রবিজ্ঞান শিক্ষা শিক্ষার্থীদের অতীতের রাষ্ট্র, রাজনীতি, সরকার কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্ত শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যতে সঠিক সিদ্ধান্ত শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যতে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে সাহায্য করতে পারে।

(৯) **ব্যবহারিক মূল্য :** রাষ্ট্রবিজ্ঞান পাঠের ব্যবহারিক মূল্য শিক্ষার্থীদের কাছে অনেক বেশি। এই বিষয়টি পাঠের মাধ্যমে তারা যেমন জাতীয় জীবনের প্রয়োজন মেটাতে পারে তেমনি তারা ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবনকে সুন্দর ও সফল করার শিক্ষাও পেতে পারে। পারিবারিক জীবনে একজন ব্যক্তিকে বিভিন্ন ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে হয় এবং প্রতি ক্ষেত্রে তার ভিন্ন ভিন্ন সামাজিক ও রাজনৈতিক দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য পালন করতে হয়। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের জ্ঞান শিক্ষার্থীকে ভবিষ্যতে এই সকল ভূমিকাগুলি সফলতার সঙ্গে পালন করতে সক্ষম করে।

কোটারি কমিশনের মতে ''যদি বিদ্যালয়কে দেশের ভাবি ব্যাঙ্ক পরিচালক, রাজনীতিবিদ, রাষ্ট্রীয় সেবক সমাজকর্মী, সংখ্যাতত্ত্ববিদ ইত্যাদি তৈরী করতে হয় তাহলে রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে বিদ্যালয়ের পাঠক্রমে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে''।

৩.৪ গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা ও বাস্তবিক জীবনে রাষ্ট্রবিজ্ঞান পাঠের প্রয়োজনীয়তা (Importance of Teaching Political Science in democratic Society and Practical Life)

বর্তমান জটিল সমাজব্যবস্থায় প্রত্যেক শিক্ষার্থীর সর্বাঙ্গীন বিকাশের জন্য রাষ্ট্রবিজ্ঞান শিক্ষা এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ভারতবর্ষের মত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সমাজব্যবস্থায় শিক্ষার্থীদের বাস্তবিক জ্ঞানের বিকাশ ও সামাজিকীকরণে রাষ্ট্রবিজ্ঞান পাঠের প্রয়োজন। রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের প্রকৃত চেতনার বিকাশ ঘটায় সুনাগরিক হতে সাহায্য করে। গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় রাষ্ট্রবিজ্ঞান পাঠের প্রয়োজনীয়তাগুলি নিম্নে আলোচনা করা হল।

(১) **রাজনৈতিক জ্ঞানের বিকাশ :** বর্তমান যুগে মানবজীবনের এমন কোন দিক নেই যা সম্পূর্ণভাবে রাষ্ট্রের প্রভাব মুক্ত। দাসযুগে কিংবা সামন্তযুগে অত্যন্ত চাতুর্যের সঙ্গে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষকে তাদের রাজনৈতিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করে রাখা হত। বর্তমানেও শাসকশ্রেণী নানাপ্রকার ছলচাতুরির আশ্রয়ে আনুগত্য বা নিজেদের কর্তৃত্ব বজায় রাখার চেষ্টা করে কিন্তু বর্তমান জাতিকল্যাণকর রাষ্ট্রের ধ্যান ধারণা গৃহীত হওয়ার ফলে রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্রের পরিধি ব্যাপকভাবে সম্প্রসারিত হয়েছে। এমতাবস্থায় প্রতিটি রাষ্ট্রের প্রত্যেক নাগরিককে সচেতনভাবে তার রাজনৈতিক অধিকার প্রয়োগ করতে কিংবা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত হতে হয়। বলাবাহুল্য, সেজন্য প্রয়োজন যথেষ্ট পরিমাণ রাজনৈতিক সচেতনতা। রাষ্ট্রবিজ্ঞান পাঠ না করলে কোন ব্যক্তির পক্ষে সঠিকভাবে অর্থাৎ রাজনৈতিক দিক থেকে সচেতনভাবে তার নাগরিক অধিকার ভোগ বা রক্ষা করা যেমন সম্ভব নয়, তেমনি রাষ্ট্র, সরকার কিংবা সমগ্র বিশ্বের প্রতি তার কর্ত্তব্য রয়েছে সে সম্পর্কে তার কোন ধারণা সঠিকভাবে জন্মায় না।

(২) **বাস্তবিক জ্ঞানের বিকাশ :** সমাজজীবনের বৈচিত্র্যপূর্ণ বিভিন্ন ঘটনার রহস্য উন্মোচন ও সামাজিক সমস্যাগুলির সমাধানের জন্য আমরা সমাজবিজ্ঞানের চর্চা করি। রাষ্ট্রবিজ্ঞান একটি সমাজবিজ্ঞান। সমাজের অন্তর্গত রাজনৈতিক আচার-আচরণ, ঘটনাবলী ও সমস্যাগুলি সম্পর্কে যথাযথভাবে আলোকিত হওয়ার জন্য রাষ্ট্রবিজ্ঞান পাঠের প্রয়োজনীয়তা আছে।

(৩) **দক্ষ নেতৃত্বের গুণাবলীর বিকাশ :** রাষ্ট্রবিজ্ঞান পাঠ শিক্ষার্থীদের দক্ষ নেতৃত্বের গুণাবলীর বিকাশ ঘটাতে পারে। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের পাঠক্রমে বিভিন্ন রাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থার তুলনামূলক আলোচনা, নীতি নির্ধারণ, প্রশাসকদের কার্যাবলী প্রভৃতি আলোচিত হয় যা আমরা সঠিকভাবে আত্মস্থ করে সচেতন নাগরিক রাজনৈতিক ব্যবস্থার বিভিন্ন স্তরে, বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করতে ও নেতৃত্ব দিতে পারে।

(৪) **সুনাগরিক হিসাবে দায়িত্ব পালন :** রাষ্ট্রবিজ্ঞান পাঠের মাধ্যমে ব্যক্তি একদিকে যেমন সমাজ, রাজনীতি, প্রশাসক প্রভৃতি সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করতে পারে, অন্যদিকে তেমনি অর্জিত জ্ঞানের সাহায্যে সমাজের মধ্যেকার নানাবিধ সমস্যার সমাধানে অগ্রণী ভূমিকা পালনে সক্ষম হয়। এইভাবে বর্ণবিদ্বেষ, উগ্রজাতীয়তাবাদ, সাম্প্রদায়িকতা, বিচ্ছিন্নতাবাদ প্রভৃতিকে নির্মূল করার কাজে সে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করতে পারে। বস্তুত রাষ্ট্রবিজ্ঞান পাঠের মাধ্যমে প্রতিটি ব্যক্তি যেমন

সমাজ সচেতন হয়ে ওঠে তেমনি অনেক ক্ষেত্রে ব্যক্তি স্বার্থের সংকীর্ণ বেড়াজাল অতিক্রম করে সুনাগরিকের দায়িত্ব পালনে তৎপর হতে সক্ষম হয়।

(৫) **দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি :** আমাদের দেশের বেশির ভাগ মানুষ তাদের নিজস্ব দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য সম্পর্কে সচেতন হয়। আর তাই কখনো বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হয়। রাষ্ট্রবিজ্ঞান শিক্ষা শিক্ষার্থীদের ভারতীয় সংবিধানে উল্লিখিত দায়িত্ব ও কর্ত্তব্যগুলি সম্পর্কে অবহিত করে।

(৬) **গণতান্ত্রিক ভাবধারার বিকাশ :** শিক্ষার্থীদের মধ্যে গণতান্ত্রিক ভাবধারার বিকাশে রাষ্ট্রবিজ্ঞান পাঠের প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য। কারণ রাষ্ট্রবিজ্ঞানের প্রধান আলোচ্য বিষয়টি হল মানুষের সাথে মানুষের রাজনৈতিক সম্পর্ককে সুনিয়ন্ত্রিত করা। রাজনৈতিক সচেতনতা বিকশিত হলে মানুষ সহজে উদার, সহনশীল ও শ্রদ্ধাশীল হয়ে উঠতে পারে। একমাত্র তবেই সমাজের অন্তর্গত সকল মানুষের মধ্যে বিভিন্ন সম্পর্কের বন্ধন দৃঢ়ভাবে রচিত হতে পারে। 'বার্নাড শ' বলেছিলেন যে, মানুষের সমাজচেতনাকে জাগিয়ে তোলাই রাষ্ট্রবিজ্ঞানের উদ্দেশ্য"।

(৭) **আদর্শ রাষ্ট্রব্যবস্থার উপলব্ধি :** রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনা অনুশীলনের মাধ্যমে মানুষ শ্রেয়তর জীবন দর্শনের সন্ধান খুঁজে পায়। উদারনীতিবিদ, ধনতান্ত্রিক সমাজবাদ, গান্ধীবাদ এবং মার্কসবাদের ন্যায় বিভিন্ন মতাদর্শের মধ্যে একটিকে আদর্শরূপে গ্রহণ করার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের জ্ঞান আগ্রহী মানুষকে সাহায্য করে।

পরিশেষে বলা যায় যে, আন্তর্জাতিকতাবোধ, বিশ্বমানবতা ও বিশ্বশান্তি ইত্যাদি আদর্শকে জাগ্রত করতে রাষ্ট্রবিজ্ঞান পাঠের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।

৩.৫ রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে সম্পর্ক (Relation between Political and other School Subject)

জ্ঞান অখণ্ড ও অবিভাজ্য। পঠন-পাঠনের সুবিধার জন্য এই অখণ্ড জ্ঞানকে বিভিন্ন বিষয়ে বিভক্ত করে পাঠক্রমে পরিবেশিত হয়ে এবং প্রতিটি বিষয়কে অন্য বিষয় থেকে বিচ্ছিন্ন করে পাঠদান করা হয়। ফলে জ্ঞান সীমিত হয়ে পরে। মনোবিজ্ঞানীদের মতে মানুষের মন স্বতন্ত্র, বিচ্ছিন্ন, পরস্পর নিরপেক্ষ জ্ঞান গ্রহণ করতে পারে না। এই কারণে আধুনিককালে অনুবন্ধ কৌশলকে শিক্ষণের ক্ষেত্রে প্রয়োগের কথা বলা হচ্ছে।

নিম্নে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সঙ্গে অন্যান্য স্কুল পাঠ্যের সম্পর্ক আলোচনা করা হল :

৩.৫.১ রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও ইতিহাসের সম্পর্ক (Relation between Political Science and History) :

রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও ইতিহাসের সম্পর্ক অতি নিবিড় এবং ঘনিষ্ঠ। এই দুটি হল সমাজবিজ্ঞানের গুরুত্বপূর্ণ শাখা। উভয় শাস্ত্রেই মানবজীবন এবং তার সামাজিক জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করে। ইতিহাসের মধ্যে আলোচিত হয় মানব সমাজের ক্রমবিকাশের ধারা, রাষ্ট্র ও সরকারের গঠন, রাষ্ট্র প্রশাসন প্রভৃতি বিষয়। ইতিহাস থেকে রাষ্ট্রবিজ্ঞান রাজনৈতিক জীবনের সঙ্গে সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় উপাদান সংগ্রহ করে। রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও ইতিহাসের মধ্যে এই নিবিড় সম্পর্ক সম্পর্কে আলোকপাত করতে গিয়ে জন সিলী (John Seeley) বলেছেন— ''রাষ্ট্রবিজ্ঞান ছাড়া ইতিহাসের আলোচনা নিস্ফল এবং ইতিহাস ছাড়া রাষ্ট্রবিজ্ঞান ভিত্তিহীন" (History without Political

Science has no fruit, Political Science without History has no root)। ফ্রিম্যান (Freeman) বলেছেন— ''ইতিহাস হল অতীত রাজনীতি এবং রাজনীতি হল বর্তমান ইতিহাস'' (History is past Politics is present history)।

রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও ইতিহাস উভয়ে উভয়ের কাছে ঋণী। কোন দেশের রাজনৈতিক জীবন সম্পর্কে আলোচনার জন্য ইতিহাসের সাহায্য গ্রহণ করা হয়। অতীত সম্পর্কে সম্যক ধারণা ছাড়া বর্তমান জীবনকে বিশ্লেষণ করা যায় না। রাজনৈতিক জীবনের ক্রমবিবর্তন ইতিহাসে মেলে। তাই ইতিহাসকে অনেকেই রাষ্ট্রবিজ্ঞানের গবেষণাগার বলে থাকেন। রাষ্ট্রের উৎপত্তি, ক্রমবিকাশ, প্রকৃতি প্রভৃতি সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা না থাকলে রাষ্ট্রের আলোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যায়; আর এসবের জন্য রাষ্ট্রবিজ্ঞানীকে ইতিহাসের দ্বারস্থ হতে হয়। তাই জেলিনকে (Jellinek) যথার্থই বলেছেন, রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলির সংগঠন ও কার্যকলাপ বুঝবার জন্য ইতিহাসের আলোচনা অত্যাবশ্যক। এছাড়া, 'জাতীয়তাবাদ', 'ব্যক্তি স্বাতন্ত্রবাদ', 'সমাজতন্ত্রবাদ' প্রভৃতি রাজনৈতিক তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় ঐতিহাসিক জ্ঞানের ওপর ভিত্তি করেই। ইতিহাসের বিশেষ পর্যায়ের আন্দোলনই পরবর্তীকালে 'গণতন্ত্র', 'জাতীয়তাবাদ', 'সমাজতন্ত্র' শীর্ষক মতবাদ গড়ে তুলতে সাহায্য করেছে। এছাড়া, রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনায় ইতিহাসের ভিত্তিতেই তুলনামূলক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে উঠেছে। রাষ্ট্রনৈতিক ধ্যান-ধারণাকে অতীতের সঙ্গে তুলনা করে প্রতিষ্ঠিত করা হয়। এইসব কারণে উইলোবি ইতিহাসকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের তৃতীয় মাত্রা (third dimension to Political Science) বলেছেন।

অপরপক্ষে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ওপরও ইতিহাসের নির্ভরশীলতা কম নয়। মানুষের রাজনৈতিক জীবনের আলোচনাকে বাদ দিয়ে কোন দেশের ইতিহাস সম্পূর্ণ হতে পারে না। প্লেটো ও অ্যারিস্টটলের তত্ত্ব, গ্রীক নগর রাষ্ট্রের প্রকৃতি, প্রশাসন ও অভিজ্ঞতা ছাড়া প্রাচীন গ্রীসের ইতিহাস আলোচনা সম্ভব নয়। পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্রের আলোচনা ব্যতীত বিংশ শতকের ইতিহাসের মূল ধারা বিশ্লেষণ সম্ভব নয়। আধুনিক ইউরোপের উদারনীতিবাদী গণতন্ত্রের ইতিহাসকে বহুলাংশে প্রভাবিত করেছিল জন লকের রাষ্ট্রচিন্তা। রুশো ও ভলতেয়ারের তত্ত্ব ছিল ফরাসী বিপ্লবের মূল প্রেরণা আবার আধুনিক ঐতিহাসিকগণ ইতিসের চর্চা বা গবেষণার সময় রাষ্ট্রবিজ্ঞানে অনুসৃত পদ্ধতিগুলির সাহায্য গ্রহণ করেন। রাষ্ট্রবিজ্ঞানীর ন্যায় ঐতিহাসিকগণও এখন বিশেষ ঘটনা, অবস্থা বা শ্রেণীর কার্যকলাপকে প্রাধান্য দিচ্ছেন। এছাড়া ইতিহাস চর্চার গতিপথ বহুলাংশে রাষ্ট্রনীতির দ্বারা প্রভাবিত, নিয়ন্ত্রিত ও নির্ধারিত হয়। বস্তুতপক্ষে রাজনৈতিক ব্যবস্থার পরিমন্ডলেই ইতিহাসের চর্চা ও অনুশীলন কার্যকর হয়। বর্তমানের ইতিহাস চর্চাকে রাজনীতি নিরপেক্ষ বলা যায় না।

তবে রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও ইতি হাস পারস্পরিক নির্ভরশীলতার বন্ধনে আবদ্ধ হলেও উভয়ের মধ্যে পার্থক্যও অত্যন্ত স্পষ্ট।

১মত, রাষ্ট্রবিজ্ঞানের তুলনায় ইতিহাসের বিষয়বস্তু ও বক্তব্য অনেক বেশি ব্যাপক। রাষ্ট্রবিজ্ঞান কেবল রাজনৈতিক জীবন ধারার সঙ্গে যুক্ত সংগ্রহ ও বিশ্লেষণে আগ্রহী। পক্ষান্তরে, ইতিহাস মানুষের সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক এবং অন্যান্য দিকের আলোচনা করে। তাই লীকক (Leacock) বলেছেন, ''ইতিহাসের কিছুটা রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অংশ, পুরোটা নয়'' (Some history is part of political Science)।

২য়ত, রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও ইতিহাসের কাজ আলাদা আলাদা। ইতিহাসের কাজ হল মূলত তথ্য সরবরাহ করা। এই তথ্য বিশ্লেষণের কাজ ইতিহাসের নয়। রাষ্ট্রবিজ্ঞান এই তথ্য বিশ্লেষণ করে এবং তারই ভিত্তিতে নানা তত্ত্ব ও ধারণার জন্ম দেয়।

৩য়ত, রাষ্ট্রবিজ্ঞানে কল্পনার স্থান আছে, ইতিহাসে তা নেই। রাষ্ট্রে উৎপত্তি ও প্রকৃতি সম্পর্কে এমন অনেক রাষ্ট্রনৈতিক মতবাদ আছে যেগুলি কল্পনাশ্রয়ী (speculative)। এসবের সঙ্গে ইতিহাসের কোন সম্পর্ক নেই।

৪র্থত, রাষ্ট্রবিজ্ঞানে কখনও কখনও উচিত-অনুচিত বা নৈতিকতা প্রাধান্য পায়, কিন্তু ইতিহাসে এসবের কোন স্থান নেই। উদাহরণস্বরূপ রাষ্ট্র কী ছিল এ নিয়েই শুধু ইতিহাসের মাথাব্যাথা; কিন্তু রাষ্ট্রবিজ্ঞানী শুধু এইটুকু নিয়ে সন্তুষ্ট থাকেন না, রাষ্ট্র কিরূপ হওয়া উচিত সে নিয়েও রাষ্ট্রবিজ্ঞানী আলোচনা করেন। এদিক থেকে বলা যায় রাষ্ট্রবিজ্ঞান কখনও নীতিবাচক (normative); কিন্তু ইতিহাস কখনই নীতিবাচক নয়।

৫মত, ইতিহাসের মধ্যে একটা ধারাবাহিকতা থাকে; কিন্তু রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে সেই ধারাবাহিকতা বজায় থাকে না।

উপসংহার : ওপরের আলোচনা থেকে দেখা যাচ্ছে রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও ইতিহাস উভয়ের আলোচনা ক্ষেত্র ও দৃষ্টিভঙ্গি ভিন্ন। এই কারণেই এরা দুটি স্বতন্ত্র বিষয় হিসাবে গড়ে উঠেছে। তা সত্ত্বেও একথা অস্বীকার করা যায় না যে, এরা একে অপরের পরিপূরক। একটিকে বাদ দিয়ে অন্যটি পূর্ণতা লাভ করতে পারে না। এজন্যই বার্জেস (Burgess) বলেছেন, 'এদের দুটিকে পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন করলে একটি পঙ্গু হবে বা প্রাণ হারাবে, আর অপরটি আলোয়ায় পর্যবসিত হবে' (Separate them... and the one becomes a cripple, if not a corpse, the othe a will-o-the wise).

৩.৫.২. রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও অর্থনীতির সম্পর্ক (Relation between Political Science and Econimics)

অতি প্রাচীনকাল থেকে রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও অর্থনীতির মধ্যে নিবিড় সম্পর্কের বিষয়টি স্বীকৃতি পেয়ে এসেছে। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে অর্থনীতি ও রাজনীতি উভয়ই সমান গুরুত্ব পেয়েছে। গ্রীক দার্শনিক এ্যারিস্টটল তাঁর 'পলিটিক্স' গ্রন্থে অর্থনীতি আলোচনা করেছিলেন রাষ্ট্রনীতির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গরূপ। সপ্তদশ শতকের ইংরেজ দার্শনিক জন লক তাঁর 'টু ট্রিটিজেন অব সিভিল অব সিভিল গভর্ণমেন্ট' গ্রন্থে এমন সব বিষয় আলোচনা করেন যার অনেকটাই অর্থবিদ্যার অন্তর্ভুক্ত। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ফ্রান্সের 'ফিজিওক্র্যাট্স্ (Physiocrats) সম্প্রদায়ভুক্ত পণ্ডিতগণ অর্থবিদ্যাকে রাজনীতির একটি শাখা (a branch of Statesmanship) বলে অভিহিত করেন। ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইংল্যান্ডে রাষ্ট্রবিজ্ঞান ক্রমশ 'রাষ্ট্রীয় অর্থনীতি' (Political Economy) নামে পরিচিত হতে থাকে। মার্কসবাদীদের মতে অর্থনীতি হল রাজনৈতিক ব্যবস্থার মৌল ভিত্তি।

❐ অর্থনীতির ওপর রাজনীতির নির্ভরশীলতা

(ক) আধুনিককালে উন্নত দেশগুলিতে রাষ্ট্র কল্যাণকর রাষ্ট্রের ভূমিকা অবতীর্ণ। এর ফলে এইসব দেশে রাষ্ট্রীয় সংগঠন নানাবিধ অর্থনৈতিক কাজকর্মের সঙ্গে জড়িত। অর্থনীতির ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের এই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাকে বাদ দিলে কোন রাজনৈতিক আলোচনাই অর্থবহ হতে পারে না। এছাড়া জাতীয় আয়ের সুষম বন্টনের স্বার্থে এই কল্যাণ রাষ্ট্রগুলিতে অনেক সময় রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের পুনর্বিন্যাস করতে হয়।

(খ) রাজনৈতিক ঘটনাবলী প্রধানত অর্থনৈতিক কারণ দ্বারা প্রভাবিত। ফরাসী বিপ্লব, দুটি বিশ্বযুদ্ধ, মহান অক্টোবর বিপ্লব প্রভৃতির পিছনে অর্থনীতিই সবচেয়ে কার্যকর ভূমিকা পালন করেছে। জারের অর্থনৈতিক ঘোষণাই রাশিয়ার বিপ্লবের প্রধান কারণ।

(গ) অর্থনীতির মূলসূত্রের ওপর ভিত্তি করে বেশিরভাগ রাজনৈতিক তত্ত্ব বা মতবাদ গড়ে ওঠে। উদাহরণস্বরূপ মার্কসবাদের অন্যতম প্রধান উৎস হল এ্যাডাম স্মিথ ও ডেভিড রিকার্ডোর 'মূল্যের শ্রম তত্ত্ব'। অবাধ বাণিজ্য নীতি (Laissez-faire)-কে কেন্দ্র করে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের উৎপত্তি।

(ঘ) রাষ্ট্রের কর্মপরিধি ও ক্ষমতার সীমা দেশের অর্থব্যবস্থার দ্বারা স্থিরীকৃত হয়ে থাকে। রাষ্ট্রশাসকরা যে আদর্শ রাষ্ট্রকাঠামোর কথা ভাবে তা রূপায়ণের দায়িত্ব পড়ে অর্থনীতিবিদদের ওপর।

(ঙ) কার্ল মার্কস রাষ্ট্রব্যবস্থাকে সমাজের অর্থনৈতিক ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে থাকা উপরি কাঠামো বলে আখ্যা দিয়েছেন। তাঁর মতে, সমাজে প্রচলিত উৎপাদন ব্যবস্থার প্রয়োজনে ও প্রভাবে রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে ওঠে।

❐ রাষ্ট্রনীতির ওপর অর্থনীতির নির্ভরশীলতা :

রাষ্ট্রবিজ্ঞান যেমন অর্থনীতির দ্বারা প্রভাবিত, অর্থনীতিও সেরূপ রাষ্ট্রবিজ্ঞানের দ্বারা প্রভাবিত।

(ক) রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে সকল অর্থনৈতিক প্রচেষ্টা বর্তমানে রাষ্ট্র কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয়। উৎপাদন, বন্টন, বিনিয়োগ, শিল্প, কৃষি, বৈদেশিক বাণিজ্য, শ্রমিক-নীতি, শুল্ক ব্যবস্থা প্রভৃতি সকল অর্থনৈতিক বিষয় এখন রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণাধীনে পরিচালিত হয়।

(খ) ভারতের মত অনগ্রসর দেশে যে পরিকল্পনার আশ্রয় নেওয়া হয়, তা রাষ্ট্র শাসকরাই স্থির করেন। রাষ্ট্রই দেশের সম্পদ-সামগ্রীকে সুপরিকল্পিত পথে ব্যবহার করে। শুধু উন্নয়নশীল দেশেই নয়, উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতেও অর্থনীতির ওপর রাষ্ট্রের ব্যাপক প্রভাব দেখা যায়।

(গ) অনেক সময় দেখা যায় দেশের সরকার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে অর্থনৈতিক নীতি ও কর্মসূচীর ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে যায়। উদাহরণস্বরূপ স্বাধীনতার পর ভারত সরকার অর্থনীতিতে মিশ্র-অর্থনীতির (Mixed economy) প্রয়োগ ঘটায়।

(ঘ) মার্কসবাদীদের মতে, অর্থনৈতিক ভিত্তির ওপর নির্ভর করে রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে উঠলেও, কখনও কখনও রাষ্ট্রব্যবস্থাও অর্থনীতির গতি প্রকৃতি নির্ধারণ করে। উদাহরণস্বরূপ ১৯১৭ সালে অক্টোবর বিপ্লবের পর রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রটির সাহায্য নিয়ে অর্থনীতিতে ব্যাপক পরিবর্তন সাধন করা হয়েছিল।

❐ রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও অর্থবিদ্যার মধ্যে পার্থক্য

রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও অর্থবিদ্যার মধ্যে নির্ভরশীল গভীর হলেও উভয়ের মধ্যে কিছু পার্থক্যও লক্ষ্য করা যায় :

(ক) বিষয়বস্তুর দিক থেকে রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও অর্থবিদ্যার মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য বিদ্যমান। আইভর ব্রাউন বলেছেন, ''অর্থবিদ্যা বিষয়কে নিয়ে এবং রাজনীতি মানুষকে নিয়ে আলোচনা করে'' (Economics is concerned with things and politics is concerned with man).

(খ) রাজনীতির আলোচনা মূল্যমান-নিরপেক্ষ নয়, অর্থনীতি মূল্যমান-নিরপেক্ষ। রাষ্ট্রবিজ্ঞান আদর্শমূলক বিজ্ঞান। অপরদিকে অর্থবিদ্যা বর্ণনামূলক এবং বস্তুনিষ্ঠ বিজ্ঞান।

(গ) রাষ্ট্রবিজ্ঞানের পরিধি অর্থবিদ্যার তুলনায় ব্যাপক। অর্থবিজ্ঞানীরা কেবল অর্থনৈতিক সূত্রাদি নির্দেশ করেন এবং বিভিন্ন অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে সূত্রগুলির কার্যকারিতা বিচার-বিশ্লেষণ করেন। পক্ষান্তরে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা রাষ্ট্রসংক্রান্ত যাবতীয় সমস্যা সম্পর্কে সামগ্রিকভাবে চিন্তা-ভাবনা করেন।

(ঘ) অর্থবিদ্যার সিদ্ধান্ত অনেকাংশেই নির্ভুল ও নিশ্চিত। কিন্তু রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সিদ্ধান্তসমূহ অনেকটাই অনুমান- নির্ভর। তাই রাষ্ট্রবিজ্ঞানের চেয়ে অর্থবিদ্যা অনেক বেশি বৈজ্ঞানিক।

উপসংহার : রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও অর্থবিদ্যার মধ্যে পার্থক্য আছে সত্য, কিন্তু এই পার্থক্য মূলত ধারণাগত ও পদ্ধতিগত; ব্যবহারিক দিক থেকে নয়। সামাজিক বৈষম্যের পিছনে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ধারণা মিলেমিশে একাকার হয়ে থাকে। অর্থনীতি ও রাজনীতি উভয়েই সামাজিক পরিবর্তনের পটভূমি তৈরি করে। আধুনিককালে গণতন্ত্র, ধনতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, সাম্রাজ্যবাদ, স্বাধীনতা, অধিকার প্রভৃতি শব্দগুলি রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উভয় অর্থেই ব্যবহৃত হয়। মার্কসবাদীদের কাছে অর্থনীতির আলোচনা বাদ দিয়ে রাজনীতির আলোচনা নিরর্থক। সাম্প্রতিককালে এ্যান্টনী ডাউনস (Downs), বুকানন (Buchanan), মাসগ্রেভ (Musgrave), টুলক (Tullock) প্রমুখ অর্থনীতিবিদেরা রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও অর্থবিদ্যাকে স্বতন্ত্র করার যে কোন প্রয়াস ব্যর্থ হতে বাধ্য।

৩.৫.৩. রাষ্ট্রবিজ্ঞান এবং সমাজবিদ্যার মধ্যে সম্পর্ক (Relation between Political Science and Sociology)

সমাজবিদ্যা হল মানুষ ও তার সামাজিক সম্পর্ককে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা বিজ্ঞান। সমাজজীবনে মানুষের কার্যকলাপ, পারস্পরিক সম্পর্ক প্রভৃতি নিয়ে যে শাস্ত্র আলোচনা করে তাকে সমাজবিদ্যা আখ্যা দেওয়া হয়। অপরদিকে রাষ্ট্রবিজ্ঞান রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয় ও সমস্যা যথা - রাষ্ট্র ও সরকারের লক্ষ্য, সরকারের গঠন ও কার্যাবলী, রাষ্ট্রের সঙ্গে নাগরিকদের সম্পর্ক প্রভৃতি আলোচনা করে। এর প্রধান আলোচ্য বিষয় হল মানুষের রাজনৈতিক জীবন। মানুষের সামাজিক জীবনের এক গুরুত্বপূর্ণ দিক হল রাজনৈতিক জীবন।

যতদিন পর্যন্ত রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনা শুধুমাত্র রাষ্ট্রকেন্দ্রিক ছিল, ততদিন পর্যন্ত রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সঙ্গে সমাজবিদ্যার সম্পর্ক ততটা ঘনিষ্ঠ হয় নি। কিন্তু আধুনিককালে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের পরিধি রাষ্ট্রের চৌহদ্দির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনা ও বিশ্লেষণ চলে বৃহত্তর সামাজিক পটভূমিতে। স্বাভাবিকভাবেই বর্তমানে রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও সমাজবিদ্যা খুবই কাছাকাছি এসে গেছে। বস্তুত, আজ এই সম্পর্ক এত ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছে যে রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও সমাজবিদ্যার সংমিশ্রণ ঘটিয়ে রাষ্ট্রীয় সমাজতত্ত্ব (Political Sociology) নামে একটি নতুন বিষয়ের চর্চা চলছে সারা পৃথিবী ব্যাপী।

❐ সমাজবিদ্যার ওপর রাষ্ট্রবিজ্ঞানের নির্ভরশীলতা

(ক) সমাজবিদ্যা থেকে রাষ্ট্রবিজ্ঞান নানা উপাদান সংগ্রহ করে। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের কেন্দ্রীয় বিষয় হল রাষ্ট্র। আর এই রাষ্ট্রের উৎপত্তি, বিকাশ, রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব, সামাজিক বিধিব্যবস্থা প্রভৃতি বিষয়ে প্রয়োজনীয়

জ্ঞান আহরণের জন্য রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে সমাজবিদ্যার দ্বারস্থ হতে হয়। সমাজ বিবর্তনের মূল সূত্রগুলি সম্বন্ধে ধারণা না থাকলে রাজনৈতিক জীবনের বস্তুনিষ্ঠ আলোচনা সম্ভব হতে পারে না। অধ্যাপক গিডিংস যথার্থই বলেছেন, ''সমাজবিদ্যার মূল সূত্রগুলি যাঁরা জানেন না তাঁদের রাষ্ট্রতত্ত্ব শিক্ষা দেওয়া, নিউটনের গতি সম্পর্কিত সূত্র বিষয়ে অজ্ঞ ব্যক্তিদের জ্যোতির্বিদ্যা শিক্ষা দেওয়া মতই অসম্ভব ব্যাপার''।

(খ) আধুনিককালের আচরণবাদী রাষ্ট্রবিজ্ঞানীগণ মানুষের আচরণসমূহ বিশ্লেষণ করার ক্ষেত্রে সমাজবিদ্যার সাহায্য গ্রহণ করে থাকেন। মানুষের রাজনৈতিক আচরণ, বিভিন্ন চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠী সম্পর্কে আলোচনা, সাম্প্রদায়িকতা, জাতপাত ইত্যাদি সম্পর্কে আলোচনা করতে গেলে রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে সমাজবিজ্ঞানের ওপর নির্ভর করতেই হয়।

(গ) কোন দেশের রাজনৈতিক সমস্যার উদ্ভব ঘটে সামাজিক সমস্যা থেকেই। সুতরাং রাজনৈতিক সমস্যার জট খুলতে হলে সমাজবিদ্যার সাহায্য প্রয়োজন।

(ঘ) ডেভিড ইস্ট, ট্যালকট-পরসন, স্যারিয়ন লেভি প্রমুখ রাষ্ট্রবিজ্ঞানীর মতে, সামাজিক পরিবেশ দ্বারা রাজনৈতিক ব্যবস্থা প্রভাবিত হয়। তাই রাষ্ট্রনীতিকে সমাজবিদ্যা থেকে পৃথক করা যায় না।

❐ রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ও সমাজবিদ্যার নির্ভরশীলতা

রাষ্ট্রবিজ্ঞান যেমন সমাজবিদ্যার ওপর নির্ভরশীল, সমাজবিদ্যাও তেমনি রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ওপর নির্ভরশীল।

(ক) সমাজবিদ্যা রাষ্ট্রবিজ্ঞান থেকে রাষ্ট্রীয় সংগঠন ও রাষ্ট্রীয় কার্যাবলী সম্পর্কিত জ্ঞান আহরণ করে। রাষ্ট্র হল সমাজের সবচেয়ে শক্তিশালী সংগঠন। কাজেই রাষ্ট্রকে বাদ দিয়ে সমাজবিদ্যার আলোচনা কখনই সম্পূর্ণ হতে পারে না।

(খ) এমন অনেক রাজনৈতিক উপাদান আছে যা সমাজজীবনের ওপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে। একথা অস্বীকার করা যায় না যে, ভারতীয় আধুনিক রাজনৈতিক ব্যবস্থা সনাতনী ভারতীয় জীবনধারায় বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন নিয়ে এসেছে। এসব ক্ষেত্রে সমাজবিদ্যার আলোচনাকে অর্থবহ করতে হলে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সাহায্য নেওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই।

(গ) বর্তমানে সমাজবিদ্যার আলোচনায় রাজনৈতিক সমস্যাদি গুরুত্ব পাচ্ছে। রাজনৈতিক দল, রাজনৈতিক নেতৃত্ব, চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠী, জনমত, নির্বাচকমণ্ডলী প্রভৃতি বিষয় আধুনিক সমাজতত্ত্বে প্রাধান্য পাচ্ছে।

❐ রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও সমাজবিদ্যার মধ্যে পার্থক্য

রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও সমাজবিদ্যার মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকা সত্ত্বেও উভয়ের মধ্যে নিম্নলিখিত পার্থক্য বিদ্যমান —

১মত, উৎপত্তির বিচারে সমাজবিদ্যা রাষ্ট্রবিজ্ঞানের তুলনায় নিতান্তই নবীন। সভ্যতার উষাকাল থেকেই রাষ্ট্রবিজ্ঞানের উৎপত্তি। সেক্ষেত্রে সমাজবিদ্যার আনুষ্ঠানিক সূচনা এই তো সেদিনের। ম্যাকাইভার ও পেজ বলেছেন, ''Sociology must be dated by decades, rather than by centuries''বস্তুত সমাজবিদ্যা হল

সমাজবিজ্ঞানের কনিষ্ঠতম শাখা। ১৮৩৯ সালে অগাস্ট কোঁত (Auguste Comte) প্রথম 'সমাজবিদ্যা' কথাটি ব্যবহার করেন।

২য়ত, সমাজবিদ্যার পরিধি রাষ্ট্রবিজ্ঞানের পরিধি অপেক্ষা ব্যাপক। কারণ, সমাজবিদ্যা মানুষের সামাজিক সম্পর্কের যাবতীয় দিক নিয়ে আলোচনা করে। পক্ষান্তরে রাষ্ট্রবিজ্ঞান সমাজবদ্ধ মানুষের রাষ্ট্রনৈতিক জীবন এবং রাষ্ট্র ও মানুষের সম্পর্কের আলোচনার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। বস্তুত, রাষ্ট্রবিজ্ঞান হল একটি বিশেষীকৃত সামাজিক বিজ্ঞান।

৩য়ত, সমাজবিদ্যা সমাজের সংগঠিত ও অসংগঠিত উভয় রূপকেই তুলে ধরার চেষ্টা করে। সেক্ষেত্রে রাষ্ট্রবিজ্ঞান শুধুমাত্র সমাজের সংগঠিত জীবন অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় জীবন নিয়ে আলোচনা করে।

৪র্থত, সমাজবিদ্যা ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান উভয়েই মানুষকে নিয়ে আলোচনা করলেও, কীভাবে সামাজিক মানুষ রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন জীবে রূপান্তরিত হল তা নিয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞান সমাজবিদ্যার মত ব্যাপকভাবে আলোচনা করে না। উভয় শাস্ত্রের মধ্যে এটিই হল মৌলিক পার্থক্য।

৫মত, রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনায় সমাজের কেবল সচেতন দিকটাই স্থান পায়। কিন্তু সমাজবিদ্যার আলোচনায় সমাজের সচেতন ও অচেতন উভয় দিকই স্থান পায়। উদাহরণস্বরূপ রাজনৈতিক জীবন শুরু হবার পূর্বে মানুষের জীবনযাত্রা কেমন ছিল তা নিয়ে সমাজতত্ত্ববিদদের ন্যায় রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা আগ্রহ দেখান না, তাঁরা শুধু রাজনীতি সচেতনতা মানুষকে নিয়েই আলোচনা করেন।

উপসংহার : রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও সমাজবিদ্যার মধ্যে উপরোক্ত পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও একথা অনস্বীকার্য যে এই দুই শাস্ত্রের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান এবং এরা একে অপরের পরিপূরক। একটিকে বাদ দিয়ে অপরটির আলোচনা সম্পূর্ণ হতে পারে না। সাম্প্রতিককালে রাষ্ট্রীয় সমাজতত্ত্ব (Political Sociology) রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও সমাজবিদ্যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য যোগসূত্র রচনা করেছে। রাষ্ট্রীয় সমাজতত্ত্ব মানুষের রাজনৈতিক আচরণ ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান নিয়ে আলোচনা করে। এগুলিকে বুঝতে ও ব্যাখ্যা করতে চাওয়া হচ্ছে সমাজবিদ্যায় ব্যবহৃত পদ্ধতির সাহায্যে। রাষ্ট্রীয় সমাজতাত্ত্বিকেরা রাজনৈতিক দল, শ্রমিক সংঘ, জনমত, ভোটদান সংক্রান্ত আচরণ, আমলাতন্ত্র ইত্যাদিকে বিশ্লেষণ করেছেন সমাজবিদ্যার আলোকে।

❐ রাষ্ট্রবিজ্ঞান এবং ভূগোলের মধ্যে সম্পর্ক (Relation between Political Science and Geography)

প্রাচীনকাল থেকেই দার্শনিকগণ মানুষের জীবন ও আচার-আচরণের ওপর ভৌগোলিক পরিবেশের প্রভাব নিয়ে আলোচনা করেছেন। এ ব্যাপারে গ্রীক দার্শনিক এ্যারিস্টটলকে পথিকৃত বলা যায়। তিনিই সর্বপ্রথম রাজনৈতিক সংগঠন ও জাতীয় চরিত্র গঠনে ভৌগোলিক পরিবেশের ব্যাপক প্রভাব সম্পর্কে আলোকপাত করেন। পরবর্তীকালে বোঁদা, মন্তেস্কু, রুশো প্রমুখ রাষ্ট্রদার্শনিকেরা এবং ম্যাকিনডার, স্পাইকম্যান, হাউশোফার প্রমুখ আধুনিক ভূতত্ত্ববিদগণ রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও ভূগোলের মধ্যে সম্পর্ক বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করেন।

ষোড়শ শতকের ফরাসী দার্শনিক জাঁ বোঁদা (Jean Bodin) বিশ্বাস করতেন মানুষের রাজনীতিকে প্রভাবিত করে বলে তাঁর ধারণা ছিল। ভৌগোলিক পরিবেশের সঙ্গে তিনি রাষ্ট্রীয় জীবনের সামঞ্জস্য রক্ষার কথা

বলেন। কারণ পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে বসবাসকারী মানুষের জীবন এক নয়। ভৌগোলিক অবস্থার তারতম্যের জন্য উত্তরাঞ্চলে মানুষ সংগ্রামে পারদর্শী, দক্ষিণাঞ্চলের মানুষ দর্শন ও চিন্তায় অগ্রণী এবং মধ্যাঞ্চলের মানুষ রাষ্ট্রনীতি ও আইনশাস্ত্রে পারঙ্গম। এই ভিন্নতার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে রাষ্ট্রনৈতিক সংগঠনের প্রকৃতি নির্ধারিত হওয়া উচিত বলে তিনি মন্তব্য করেন।

সপ্তদশ শতকের অপর এক ফরাসী রাষ্ট্রদার্শনিক মন্তেস্কু (Montesquieu) রাষ্ট্রনৈতিক সংগঠনের ওপর প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রভাবের কথা বলেন। তিনি বলেন মানুষের চরিত্র ও সামর্থ্য অনেকটা জলবায়ুর প্রভাবে গড়ে ওঠে। তিনি বলেন শৈত্য প্রধান অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য রাষ্ট্রনৈতিক স্বাধীনতা এবং উষ্ণ অঞ্চলে দেখা যায় দাসত্ব প্রথা। পার্বত্য অঞ্চল স্বাধীনতার উপযোগী, কিন্তু উর্বর সমতলভূমি স্বৈরাচারতন্ত্রের আবাসভূমি। সুতরাং, যে ধরনের শাসন ব্যবস্থা বা প্রতিষ্ঠান উত্তর ইউরোপীয় অধিবাসীদের উপযুক্ত, সেই ধরনের প্রতিষ্ঠান আফ্রিকার নিগ্রোদের উপযুক্ত হতে পারে না বলে মন্তেস্কুর বিশ্বাস।

বোঁদা ও মন্তেস্কুর ন্যায় অপর এক ফরাসী দার্শনিক রুশো (Rousseau) রাষ্ট্রনৈতিক প্রতিষ্ঠানের ওপর জলবায়ুর ব্যাপক প্রভাবের কথা স্বীকার করেন। তিনি লক্ষ্য করেন যে, শীতপ্রধান দেশে বর্বরতা, উষ্ণদেশে স্বৈরতন্ত্র এবং নীতিশীতোষ্ণ দেশে আদর্শ শাসন ব্যবস্থা গড়ে ওঠে "... warm climates are conductive to dwspotism, cold climates to barbarism and moderate climate to a good polity" – Rousseau.

পরবর্তীকালে বাক্‌ল (Bucklet), ব্লুন্টিসলি (Bluntschli), হানটিংটন (Huntington) প্রমুখ অপেক্ষাকৃত আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরাও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান, সরকারী নীতি ও কার্যাবলীর ওপর ভৌগোলিক উপাদানসমূহের প্রভাব-প্রতিক্রিয়া গুরুত্ব সহকারে আলোচনা করেছেন। সাম্প্রতিককালে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনায় ভূকেন্দ্রিক বিশ্লেষণ সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব পেয়েছিল ম্যাকিনডার (H. Mackinder)-এর 'জিওপলিটিক্স'-এর তত্ত্বে। জার্মানিতে নাৎসিবাদের উত্থানে এই তত্ত্বটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়।

জাতীয়তাবাদের বিকাশ ও বিস্তারের ক্ষেত্রেও ভৌগোলিক পরিবেশের গুরুত্বকে অস্বীকার করা যায় না। একই ভৌগোলিক এলাকার মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে বসবাস করলে অধিবাসীদের মধ্যে যে গভীর একাত্মবোধ সৃষ্টি হয় তা জাতীয় জনসমাজ সৃষ্টিতে সাহায্য করে।

কোন রাষ্ট্রের জাতীয় নীতি নির্ধারণের ব্যাপারে ভৌগোলিক পরিবেশের যথেষ্ট প্রভাব থাকে। আবার পররাষ্ট্র নীতি নির্ধারণের ব্যাপারেও কোন রাষ্ট্রের ভৌগোলিক অবস্থান, আয়তন, প্রাকৃতিক সম্পদ, জনসংখ্যা প্রভৃতি উপাদানগুলির যথেষ্ট ভূমিকা থাকে। ক্ষুদ্র রাষ্ট্র ভুটানের ভৌগোলিক অবস্থান তাকে ভারতের আশ্রিত রাষ্ট্রে পরিণত হতে বাধ্য করেছে।

মূল্যায়ন : ওপরের আলোচনা থেকে দেখা যাচ্ছে যে রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও ভূগোলের মধ্যে সম্পর্ক অতিশয় ঘনিষ্ঠ। এই দুটি শাস্ত্রের মধ্যে এই সম্পর্ককে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক ভূগোল (Political Geography) নামে ভূগোলের একটি শাখা গড়ে উঠেছে। ১৮৯৭ সালে জার্মানির ভূতত্ত্ববিদ্ ফ্রেদরিক র‍্যাটজেল-এর 'Political Geography' গ্রন্থটি প্রকাশিত হবার পর থেকে ভূগোলের এই শাখাটি দ্রুত প্রসার লাভ করে।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সঙ্গে ভূগোলের সম্পর্ক নির্ধারণের ক্ষেত্রে যেসব যুক্তির অবতারণা করা হয় সেগুলির সবগুলিই যে সমালোচনার ঊর্ধ্বে তা নয়। ভৌগোলিক পরিবেশ ও জলবায়ুর প্রভাবেই ভিন্ন ভিন্ন রাষ্ট্রব্যবস্থা

গড়ে ওঠে একথা ঠিক নয়। উদারহণস্বরূপ জাপান ও কোরিয়াতে প্রায় একই ভৌগোলিক পরিবেশ থাকা সত্ত্বেও জাপানে ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা এবং কোরিয়ায় সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে ওঠেছে। ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশ প্রায় একই ভৌগোলিক পরিবেশ থাকা সত্ত্বেও এই তিনটি দেশের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক নীতিতে অভিন্নতা লক্ষ্য করা যায় না। একটি দেশের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক নীতি নির্ধারণে ভৌগোলিক উপাদানসমূহের অবিস্থিতিই যথেষ্ট নয়, সেগুলিকে যথাযথভাবে ব্যবহার করা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে সুযোগ্য নেতৃত্বের ভূমিকাও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। উদাহরণস্বরূপ, একই ভৌগোলিক উপাদানসমূহ থাকা সত্ত্বেও অক্টোবর বিপ্লবের পরবর্তী পর্যায়ে সোভিয়েত রাশিয়ার সুযোগ্য নেতৃত্বের প্রভাব সেই দেশের জাতীয় শক্তি আগের তুলনায় অতি অল্প সময়েই বেশ কয়েকগুণ বেড়ে যায়।

উপসংহারে বলা যায় রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিষয়বস্তুর ওপর ভৌগোলিক উপাদানের প্রভাব স্বীকার করলেও উভয়ের মধ্যে একটা সীমারেখা টানার প্রয়োজন আছে। রাষ্ট্রনৈতিক সংগঠন ও সরকারের ওপর ভৌগোলিক পরিবেশের প্রভাবকে অতিরঞ্জিত করে দেখা ঠিক নয়। মার্কসবাদীরা সমাজ তথা রাষ্ট্রের পরিবর্তনের ক্ষেত্রে ভৌগোলিক পরিবেশের প্রভাবকে স্বীকার করলেও একে প্রধান শক্তি বলে মনে করেন না। ইংল্যান্ডের দু হাজার বছরের ইতিহাসে ভৌগোলিক পরিবেশে তেমন কোন উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটে নি। কিন্তু এই দু হাজার বছরের মধ্যেই সেখানে ক্রীতদাস প্রথার বিলোপ হয়ে সামন্ততন্ত্র এসেছে, আবার সামন্ততন্ত্রকে হঠিয়ে দিয়ে ধনতন্ত্রের আবির্ভাব ঘটেছে; চরম রাজতন্ত্রের জায়গায় সীমাবদ্ধ রাজতন্ত্রের আবির্ভাব ঘটেছে; আরও কত কী রাজনৈতিক পরিবর্তন ঘটেছে। তাই স্তালিন (J.V. Stalin) বলেছেন, সামাজিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে ভৌগোলিক পরিবেশ প্রধান কারণ বা নিয়ন্তা হতে পারে না (Geographical environment can not be the chief cause, the determining cause of social development)

৩.৬. রাষ্ট্রবিজ্ঞান শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য (Aims of Objectives of Teaching Political Science in School)

বর্তমান আধুনিক জটিল সমাজব্যবস্থায় রাষ্ট্রবিজ্ঞান শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যগুলি এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। 'লক্ষ্য' ও 'উদ্দেশ্য' শব্দ দুটি একই অর্থে ব্যবহৃত হলেও শব্দ দুটির মধ্যে কিছু পার্থক্য অবশ্যই বিদ্যমান। উদ্দেশ্যের থেকে লক্ষ্য অনেক বেশি দার্শনিক তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত। উদ্দেশ্য অনেকটা বাস্তব ফল লাভের ইঙ্গিত দেয় এবং লক্ষ্য শব্দটি অনেক ব্যাপক ও বিস্তৃত। চূড়ান্ত ফললাভের কথা বলে লক্ষ্য অর্থাৎ চূড়ান্ত ফললাভের রাস্তা হচ্ছে উদ্দেশ্য। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিষয় সম্পর্কে সাহায্য করা হল উদ্দেশ্য এবং বিষয়বস্তু পঠন-পাঠনের মাধ্যমে এই উদ্দেশ্য সাধন হতে পারে। রাষ্ট্রবিজ্ঞান পাঠের ফলে শিক্ষার্থীর আচরণের মধ্যে যে সার্বিক পরিবর্তন সাধিত হয় তাই হল লক্ষ্য।

সুতরাং বলা যেতে পারে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের মধ্যে সূক্ষ্ম পার্থক্য থাকলেও শব্দ দুটি একই অর্থে ব্যবহৃত হয়। নীচে রাষ্ট্রবিজ্ঞান পাঠের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যগুলি আলোচনা করা হয়।

❑ রাষ্ট্রবিজ্ঞান শিক্ষার উদ্দেশ্য (Objectives of Teaching Political Science)

রাষ্ট্রবিজ্ঞান শিক্ষণের উদ্দেশ্যগুলিকে চিহ্নিত করতে গিয়ে অ্যাডাম ওয়েলেসলী নিম্নলিখিত বিষয়গুলি চিহ্নিত করেছেন। যেমন —

(ক) রাষ্ট্রবিজ্ঞান শিক্ষণের উদ্দেশ্য হল গণতন্ত্রের একাধিক রাজনৈতিক দলের গঠন ও কার্যাবলী সম্পর্কে জানা।

(খ) নাগরিক কর্ত্তব্য ও অধিকার সম্পর্কে সচেতন হওয়া।

(গ) সরকারের প্রয়োজনীয়তা ও পরিকাঠামো সম্পর্কে জ্ঞানার্জন।

(ঘ) রাষ্ট্রবিজ্ঞান শিক্ষণের মাধ্যমে বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের ভাবধারায় বিশ্বাসী করে তোলা।

(ঙ) সহযোগিতা, সহানুভূতি ও প্রীতির সম্পর্ক শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রগাঢ় করা।

(চ) বিশ্বশান্তি ও মানবকল্যাণ সাধনের মনোভাব গঠন করা।

বস্তুত বিভিন্ন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী বিভিন্ন ভাবে রাষ্ট্রবিজ্ঞান শিক্ষণের উদ্দেশ্যগুলিকে চিহ্নিত করেছেন। যেমন ১৯৮৬ সালে National Policy of Education রাষ্ট্রবিজ্ঞান শিক্ষণের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলেছেন —

(ক) শিক্ষার্থীদের জাতীয় সহানুভূতি, মূল্যবোধ সমৃদ্ধ ও উন্নতি করা।

(খ) মানবিক মূল্যবোধ জাগ্রত করা।

(গ) দেশের মিশ্র সংস্কৃতি প্রতি শ্রদ্ধাশীল করে গড়ে তোলা।

❑ রাষ্ট্রবিজ্ঞান শিক্ষার লক্ষ্য (Aims of Teaching Political Science)

মানুষ একটি সামাজিক জীব। আর সমাজের মধ্যে প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমেই সে তার জীবন অতিবাহিত করে। আর এই সামাজিক কার্যকলাপ রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। রাষ্ট্রবিজ্ঞান মানুষকে তার দৈনন্দিন জীবনের বাস্তবিক জ্ঞানের বা আচরণের বিকাশ ঘটায়। তাই রাষ্ট্রবিজ্ঞান পাঠের প্রধান প্রধান লক্ষ্যগুলি নিম্নরূপ —

(১) রাষ্ট্র সম্পর্কে জ্ঞানের বিকাশ : রাষ্ট্রবিজ্ঞান পাঠের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য হল রাষ্ট্র সম্পর্কে জ্ঞানের বিকাশ ঘটানো। রাষ্ট্রবিজ্ঞান শিক্ষার ফলে শিক্ষার্থীদের রাষ্ট্র, রাষ্ট্রের আইন, প্রশাসন, রাজনৈতিক দল, দায়িত্ব-কর্ত্তব্য ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক সম্বন্ধে জ্ঞানের বিকাশ ঘটে।

(২) রাষ্ট্রবিজ্ঞান শিক্ষণের লক্ষ্য অনেক বৃহৎ দীর্ঘমেয়াদী। রাষ্ট্রবিজ্ঞান শিক্ষণ কেবলমাত্র বাস্তব জ্ঞান ও সমস্যার পর্যাপ্ত সমাধান করার রাস্তাই প্রদর্শন করে না, গড়ে তোলে একটি নির্দিষ্ট রাজনৈতিক, সামাজিক ও আন্তর্জাতিক জীবনবোধ। তাই গণতান্ত্রিক চেতনা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রবিজ্ঞান শিক্ষণের লক্ষ্য হল আন্তর্জাতিক মনোভাবাপন্ন ও প্রকৃত মানুষ তৈরী করা।

(৩) আচরণের পরিবর্তন : রাষ্ট্রবিজ্ঞান শিক্ষার অন্যতম প্রধান লক্ষ্য হল শিক্ষার্থীর আচরণের পরিবর্তন ঘটানো। শিক্ষার্থীদের মধ্যে সামাজিক ও রাজনৈতিক চেতনা বৃদ্ধির দ্বারা শিক্ষার্থীদের আচরণের পরিবর্তন ঘটায়।

(৪) **সামাজিক ও রাজনৈতিক চেতনা বৃদ্ধি :** সামাজিক ও রাজনৈতিক চেতনা বৃদ্ধি হল রাষ্ট্রবিজ্ঞান শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য।

(৫) **আদর্শ নাগরিক তৈরি করা :** রাষ্ট্রবিজ্ঞান শিক্ষণের উল্লেখযোগ্য লক্ষ্য হল শিক্ষার্থীদের মধ্যে আদর্শ গুণাবলীর বিকাশ ঘটানো। একজন আদর্শ নাগরিকের কী কী গুণাবলী ও কর্ত্তব্য থাকা প্রয়োজন তার বিকাশ ঘটানো রাষ্ট্রবিজ্ঞান শিক্ষণের লক্ষ্য।

(৬) **জাতীয় ঐতিহ্যের সংরক্ষণ :** প্রত্যেক শিক্ষার্থীদের মধ্যে জাতীয় ঐতিহ্যের বিকাশ ঘটানো রাষ্ট্রবিজ্ঞান শিক্ষণের অন্যতম লক্ষ্য। ভারতের সংবিধান শিক্ষার সাহায্যে শিক্ষার্থীদের মধ্যে এই সব গুণাবলীর বিকাশ ঘটে।

(৭) **শিক্ষার্থীদের নেতৃত্বদানের ক্ষমতা বৃদ্ধি করা :** শিক্ষার্থীদের মধ্যে নেতৃত্ব দানের ক্ষমতার বিকাশ ঘটানো রাষ্ট্রবিজ্ঞান শিক্ষণের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। যাতে শিক্ষার্থীরা সমাজের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে অংশগ্রহণ করতে পারে, সমাজকে অগ্রগতি পথে নিয়ে যেতে পারে এবং সরকার প্রদত্ত অধিকার ভোগ ও স্ব স্ব দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট হতে পারে। পরবর্তীকালে দেশকে যোগ্য নেতৃত্ব দিতে পারে।

৩.৭. সারসংক্ষেপ (Summary)

শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য শিক্ষার্থীরা সার্বিক বিকাশ সাধন। মানব জীবনের চিন্তা ও কর্মের অনেকটাই আবর্তিত হয় রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে কেন্দ্র করে। বর্তমান শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থায় উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে রাষ্ট্রবিজ্ঞান পাঠের পক্ষে যুক্তিগুলি হল - মনস্তাত্ত্বিক যুক্তি, সুনাগরিক গঠনের যুক্তি, বাস্তব জ্ঞানের বিকাশের যুক্তি, সামাজিক বিকাশের যুক্তি, সামাজিক মূল্য, সামাজিক গুণের বিকাশ, ঐতিহাসিক মূল্য এবং ব্যবহারিক মূল্য।

রাষ্ট্রবিজ্ঞান পাঠের প্রয়োজনীয়তাগুলি হল - রাজনৈতিক জ্ঞানের বিকাশ, দক্ষ, নেতৃত্বের গুণাবলীর বিকাশ, সুনাগরিক, দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি, গণতান্ত্রিক ভাবধারার বিকাশ ও আদর্শ রাষ্ট্রব্যবস্থার উপলব্ধি। এছাড়াও আন্তর্জাতিকতাবোধ, বিশ্বমানবতা ও বিশ্বশান্তি ইত্যাদি আদর্শকে জাগ্রত করতে রাষ্ট্রবিজ্ঞান পাঠের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সঙ্গে সমাজবিজ্ঞানের অন্যান্য শাখার সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড় ও ঘনিষ্ঠ। একটির বিষয়বস্তুকে বুঝতে গেলে অন্যটির সাহায্য অপরিহার্য্য। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সঙ্গে সমাজবিজ্ঞানের অন্যান্য বিষয়গুলির মিল থাকলেও এদের মধ্যে কিছু আমিলও বর্তমান।

৩.৮. গ্রন্থপঞ্জী (References)

(১) প্রামাণিক, নিমাই, রাষ্ট্রবিজ্ঞানের রূপরেখা, ছায়া প্রকাশনী, মার্চ - ২০০৫

(২) দালাল, প্রণব কুমার, রাষ্ট্রবিজ্ঞান সমগ্র, আরামবাগ বুক হাউস।

(৩) মুখোপাধ্যায়, অমল কুমার উচ্চমাধ্যমিক রাষ্ট্রবিজ্ঞান, শ্রীধর পাবলিশার্স।

(৪) সিংহ, দেবব্রত, উচ্চমাধ্যমিক রাষ্ট্রবিজ্ঞান শিক্ষক, ছায়া প্রকাশনী।

(৫) দত্ত, মৃণালকান্তি, উচ্চমাধ্যমিক রাষ্ট্রবিজ্ঞান সমগ্র, এ.বি.এস. পাবলিশিং হাউস।

(৬) মজুমদার, স্মৃতিকণা, রাষ্ট্রবিজ্ঞান শিক্ষণ পদ্ধতি, রীতা পাবলিকেশন।

(৭) হালদার, শ্রী গৌরদাস, শিক্ষা প্রসঙ্গে অর্থনীতি ও পৌরবিজ্ঞান, ব্যানার্জী পাবলিশার্স।

৩.৯. প্রশ্নাবলী (Self Check Questiosn)

(১) উচ্চমাধ্যমিক স্তরে রাষ্ট্রবিজ্ঞান শিক্ষণের/শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যগুলি আলোচনা করুন। (Discuss the aims and objectives teaching Political Science in the Higher Secondary Stages of Education) (B.Ed Exam-2013).

(২) রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও ইতিহাসের সম্পর্ক আলোচনা করুন। (B.Ed Exam-2014).

(৩) রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও অর্থনীতির সম্পর্ক আলোচনা করুন। (B.Ed Exam-2013).

(৪) বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের স্থান এর সম্পর্কে আলোচনা করুন। (B.Ed Exam-2014).

(৫) বাস্তবজীবন ও গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় রাষ্ট্রবিজ্ঞানের গুরুত্ব আলোচনা করুন।

(৬) রাষ্ট্রবিজ্ঞান কিভাবে ইতিহাস ও সমাজবিজ্ঞানের সঙ্গে সম্পর্কিত? (B.Ed Exam-2014).

UNIT - 4

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের শিক্ষণ পদ্ধতি

(METHODS OF TEACHING POLITICAL SCIENCE)

৪.১. উদ্দেশ্য (OBJECTIVE) :

শ্রেণীকক্ষে শিক্ষণের জন্য শিক্ষণ পদ্ধতির আবশ্যকতা প্রশ্নাতীত। শিক্ষণ পদ্ধতি এমন এক কৌশল যা শিক্ষকের দ্বারা শ্রেণী শিক্ষণের সময় ব্যবহৃত হয়। শিক্ষণ পদ্ধতির যুক্তিপূর্ণ প্রক্রিয়া প্রয়োগের দ্বারা শিক্ষণের বিষয়বস্তু বিজ্ঞানসম্মতভাবে বিশ্লেষণ করা হয়। অন্য ভাষায় বলা যায়, শিক্ষণ পদ্ধতি হল শৃঙ্খলাবদ্ধ, যুক্তিপূর্ণ এবং কার্যকর পদক্ষেপ যা শ্রেণী শিক্ষণের সময় শিক্ষার্থীদের প্রতি নির্দেশনা প্রদানের জন্য ব্যবহৃত হয়। উল্লেখযোগ্য হল, শ্রেণী শিক্ষণ এবং নির্দেশনা প্রদান যেহেতু যান্ত্রিক প্রক্রিয়া নয় সেহেতু শিক্ষণ পদ্ধতির প্রয়োগের ক্ষেত্রে শিক্ষকের নিজস্ব কৌশল, উদ্ভাবনী শক্তি, তাৎক্ষণিক উদাহরণ প্রদান এবং ব্যক্তিত্বের গভীর প্রভাব লক্ষ করা যায়।

৪.২ সূচনা (INTRODUCTION) :

শিক্ষণ-শিখন প্রক্রিয়ার সাথে শিক্ষণ পদ্ধতির ধারণা ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। শিক্ষণ পদ্ধতির বাস্তব প্রয়োগ ব্যতীত বিজ্ঞানসম্মতভাবে শিক্ষণ-শিখন প্রক্রিয়া পরিচালনা করা যায় না। শিক্ষণ পদ্ধতির প্রয়োগের দ্বারা শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মধ্যে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ স্থাপিত হয়। কারণ, বিজ্ঞানসম্মত শিক্ষণ পদ্ধতি প্রয়োগের দ্বারা শিক্ষক যখন শিক্ষণ সংক্রান্ত নির্দেশনা প্রয়োগ করেন, শিক্ষর্থীদের পক্ষে তখন সেই নির্দেশনা গ্রহণ সহজ হয়। মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশনের মতে, শিক্ষণ পদ্ধতির মাধ্যমেই শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মধ্যে ধারবাহিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয় যার ফলে উভয়ের মধ্যে সম্পর্কের ভিত্তি দৃঢ় হয়। সম্পর্কের এই দৃঢ় ভিত্তি শিক্ষার্থীদের মনের ও ব্যক্তিত্বের উপর প্রভাব বিস্তার করে। এমনকি তাদের বুদ্ধিমার্গীয় বিকাশ, প্রাক্ষোভিক বিকাশ, দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধের কাঠামোর উপর এই সম্পর্কের ইতিবাচক প্রভাব দেখা যায়।

৪.৩ শিক্ষণ পদ্ধতির ঐতিহাসিক বিকাশ (HISTORICAL DEVELOPMENT OF METHODS OF TEACHING) :

শিক্ষা দার্শনিকদের মধ্যে জে. এ. কমেনিয়াস (১৫৯২-১৬৭০) সর্বপ্রথম বিজ্ঞানসম্মত নীতির ভিত্তিতে এক শিক্ষণ পদ্ধতি উপস্থাপন করেন। তিনি বিশ্বাস করতেন প্রতিটি নির্দেশনা অত্যন্ত সর্তকতার সাথে পর্যায়ক্রমে প্রদান করতে হবে। তাঁর মতে নির্দেশনার পাঁচটি আবশ্যিক উপাদান হল :

১) সংবেদন অভিজ্ঞতার গুরুত্ব।

২) প্রকৃতি।

৩) পাঠ্যক্রম।

৪) কর্মদ্যোগ এবং

৫) উৎসাহ।

জে. এইচ. পেস্তালজী (১৭৪৬-১৮২৭) শিক্ষার প্রক্রিয়াকে বিজ্ঞানসম্মত করতে চেয়েছিলেন। এক্ষেত্রে তাঁর বিখ্যাত উক্তি হল ঃ 'আমি শিক্ষাকে বিজ্ঞানসম্মত করতে চাই'। এর থেকে বোঝা যায় তিনি বিজ্ঞানসম্মত শিক্ষণ পদ্ধতির প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সম্যক সচেতন ছিলেন। তাঁর মতে শিক্ষার অর্থই হল; 'শিশুর অন্তর্নিহিত গুণাবলী বাইরে বার করার প্রক্রিয়া।' বস্তুতপক্ষে, শিশুর প্রকৃতির মধ্যেই শিক্ষার সম্ভাবনা নিহিত আছে। এই চিন্তাধারার সাথে সামঞ্জস্য রেখে শিক্ষণ পদ্ধতির বিকাশ ও প্রয়োগ করতে হবে।

এফ. ফ্রয়বেল (১৭৮২-১৮৫২) কিন্ডারগার্ডেন পদ্ধতি রচনার মাধ্যমে অমর হয়ে আছেন। কিন্ডারগার্ডেনের অর্থ হল শিশু উদ্যান। ফ্রয়বেলের মতে বিদ্যালয় হল শিশু উদ্যান স্বরূপ। তাঁর মতে শিশু এই উদ্যানের চারা গাছ এবং শিক্ষক মালী রূপে কাজ করে। তাঁর শিক্ষা পদ্ধতির মৌলিক উপাদান হল আত্মসক্রিয়তা। তাঁর মতে শিশু স্বভাবগতভাবে সক্রিয়। অর্থাৎ শিশুর আত্মসক্রিয়তা বৃদ্ধির জন্য শিক্ষককে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। শিশুর আত্মসক্রিয়তা যত বৃদ্ধি পাবে, শিশুর শিখন তত সুনিশ্চিত হবে। সুতরাং যেকোন শিক্ষণ পদ্ধতি শিশুর আত্মসক্রিয়তাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠবে।

জাঁ জ্যাক রুশো (১৭১২-১৭৭৮) তাঁর 'এমিল' গ্রন্থে তৎকালীন সমাজে প্রচলিত শিশু শিক্ষার যান্ত্রিক ও অমানবিক শিক্ষণ পদ্ধতির সমালোচনা করেছেন। এই যান্ত্রিক পদ্ধতির পরিবর্তে তিনি প্রাকৃতিক নিয়মের সাথে সাযুজ্যপূর্ণ এক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির প্রয়োগের উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। প্রচলিত শিক্ষা পদ্ধতিকে তিনি 'Positive education ' বলেছেন। এর পরিবর্তে তিনি 'negative education'-এর ধারণা প্রয়োগের কথা প্রচার করেন। Negative education ধারণার মূল ভিত্তি হল ঃ 'শিশু প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার মাধ্যমে শিখবে।' এজন্য তিনি learning by doing-এর কথা বলেছেন। প্রকৃতপক্ষে, রুশো heuristic পদ্ধতির প্রয়োগের উপর বিশ্বাসী ছিলেন, কারণ এই পদ্ধতি শিশু শিক্ষার্থীকে আবিষ্কারকের কেন্দ্রে স্থাপন করে। শিক্ষা বিজ্ঞানের বিশেষজ্ঞদের মতে রুশোর এই যুগান্তকারী ও বৈপ্লবিক ধারণা Laboratory method, Learning by doing method, Learning by sense experience পদ্ধতি উদ্ভবের পথ প্রশস্ত করেছে।

জন ফ্রেডারিক হারবার্টের (১৭৭৬-১৮৪১) শিক্ষা পদ্ধতির মূল ধারণা 'অনুবন্ধের নীতি' এবং 'কেন্দ্রীকরণের নীতি'-র ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে। অনুবন্ধের নীতি অনুসারে পাঠক্রমের বিষয়গুলিকে পৃথক পৃথকভাবে শিক্ষণের পরিবর্তে, প্রতিটি বিষয়কে এক অখণ্ড পাঠ্যবিষয়ের অংশরূপে গণ্য করা হয়। এভাবে ভাবনা-চিন্তা করলে শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন পাঠ্য-বিষয়কে একে অপরের থেকে বিচ্ছিন্ন মনে করবে না। এর ফলে শ্রেণী শিক্ষণ ও নির্দেশনা প্রদান সহজ হবে। সুতরাং অনুবন্ধ পদ্ধতির সফল প্রয়োগের দ্বারা শিক্ষার্থীদের কাছে পাঠ্যক্রমের এক সংহত রূপ উপস্থাপন সম্ভব।

৪.৩.১ উন্নত শিক্ষণ পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য (Features of Good Methods of Teaching) :

শিক্ষণ পদ্ধতির মূল লক্ষ্য হল পাঠ্যবিষয়কে সহজ ও সরল ভাষায় শিক্ষার্থীদের কাছে বিশ্লেষণ করা। সুতরাং একটি ভাল শিক্ষণ পদ্ধতির নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্য থাকা প্রয়োজন :

(১) শিক্ষার প্রতি ভালবাসা সঞ্চারণ,

(২) সচারুভাবে ও দক্ষতার সাথে কাজ শেষ করার ইচ্ছে সঞ্চারণ,

(৩) সুস্পষ্ট চিন্তাধারার বিকাশের সহায়ক,

(৪) শিক্ষার্থীর আগ্রহের পরিধি বৃদ্ধির সহায়ক,

(৫) ব্যক্তিগত উদ্যোগ গ্রহণ ও স্বাধীনভাবে কাজ করার দক্ষতা বৃদ্ধির সহায়ক

(৬) প্রাত্যহিক জীবনে জ্ঞানের প্রয়োগের সম্ভাবনা সৃষ্টি, এবং

(৭) বিভিন্ন reference material ব্যবহারে প্রশিক্ষণ প্রদান।

৪.৩.২ রাষ্ট্রবিজ্ঞান শিক্ষণের পদ্ধতি (Political Science Teaching Method) :

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের শিক্ষণের জন্য একাধিক পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল— বক্তৃতা পদ্ধতি, আরোহ পদ্ধতি, অবরোহ পদ্ধতি, আলোচনা পদ্ধতি, প্রকল্প পদ্ধতি। এছাড়া ব্যক্তিগত নির্দেশনা এবং Computer Assisted Instruction (CAI)-এর ব্যবহার লক্ষ করা যায়।

৪.৩.২.১ বক্তৃতা পদ্ধতি (Lecture Method) :

বক্তৃতা অর্থাৎ Lecture শব্দটি মধ্যযুগে ব্যবহৃত ল্যাটিন শব্দ Lectura থেকে উদ্ভূত যার অর্থ উচ্চ স্বরে পাঠ করা (to read loudly)। বক্তৃতা পদ্ধতি সম্ভবত প্রাচীনতম পদ্ধতি। শিক্ষার আদর্শবাদী দার্শনিকেরা এই পদ্ধতি সর্বপ্রথম ব্যবহার করেন।

এই পদ্ধতি অনুসারে শিক্ষক মৌখিক উপায়ে পাঠ্যবিষয়বস্তু শিক্ষার্থীদের কাছে উপস্থাপন করেন। তিনি এই পদ্ধতির মাধ্যমে ধীরে ধীরে পাঠ্যবিষয়ের ধারণা সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করেন এবং প্রয়োজনীয় তথ্য উপস্থাপন করেন। এককথায়, শিক্ষক দায়িত্ব সহকারে বক্তৃতার মাধ্যমে বিষয়বস্তু শিক্ষার্থীর বোধগম্য করে তোলার চেষ্টা করেন।

শিক্ষার্থীরা শিক্ষণ-শিখনে প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ না করলেও নিবিষ্টমনে শিক্ষকমহাশয়ের বক্তৃতা শুনতে থাকে। অনেক ক্ষেত্রে বক্তৃতার সমগ্র অংশ বা সারাংশ লিখিত আকারে শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিতরণ করা হয়। এর ফলে বক্তৃতা. মনোযোগ প্রদান সহজ হয়। বক্তৃতার শেষে প্রশ্নোত্তর পর্ব অনুষ্ঠিত হয়।

বক্তৃতা পদ্ধতির সাফল্যের জন্য চার্ট, মডেল, ওভারহেড প্রোজেক্টার ইত্যাদি ব্যবহার করা যেতে পারে। বক্তার গলার স্বর, স্বরক্ষেপণ, মঞ্চের উপর চলাফেরা ইত্যাদির মাধ্যমেও বক্তৃতা পদ্ধতি মনোগ্রাহী করা সম্ভব। সর্বোপরি, বক্তার ব্যক্তিত্ব এবং উপস্থাপনার Style-এর উপর বক্তৃতা পদ্ধতির সাফল্য নির্ভর করে।

৪.৩.২.২ বক্তৃতা পদ্ধতির উপযোগিতা (Merits of Lecture Method) :

বক্তৃতা পদ্ধতির জনপ্রিয়তা অস্বীকার করা যায় না, কারণ এই পদ্ধতির একাধিক উপযোগিতা আছে—

(১) বক্তৃতা পদ্ধতিতে অর্থের সাশ্রয় হয়, কারণ অতি সহজেই অল্প খরচে এই পদ্ধতি প্রয়োগ করা যায়।

(২) বক্তৃতা পদ্ধতি সময় সাশ্রয়কারী; এজন্য পাঠ্যসূচীর সব বিষয় নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অর্থাৎ শিক্ষা বর্ষের মধ্যেই শেষ করা যায়।

(৩) বক্তৃতা পদ্ধতির মাধ্যমে শিক্ষক অতি সহজেই শিক্ষণসংক্রান্ত দায়িত্ব পালন করতে পারেন।

(৪) তথ্য পরিবেশন ও বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে বক্তৃতা পদ্ধতি অত্যন্ত কার্যকর।

(৫) এই পদ্ধতি অত্যন্ত নমনীয়; কারণ শিক্ষার্থীদের আগ্রহ ও aptitude অনুসারে শিক্ষক বক্তৃতার ধরন পরিবর্তন করতে পারেন।

(৬) বক্তৃতা পদ্ধতির মাধমে শিক্ষক যেকোন বিষয়ের উপর অতি সহজেই শিক্ষার্থীদের জন্য নির্দেশনা দিতে পারেন।

(৭) বক্তৃতার মাধ্যমে শিক্ষকমহাশয় শিক্ষার্থীদের কল্পনা শক্তি উজ্জীবিত করতে পারেন।

(৮) ভাল বক্তৃতা শিক্ষার্থীদের

(৯) বক্তৃতার মাধ্যমে শিক্ষকমহাশয় শিক্ষার্থীদের কাছে পাঠ্যবিষয় সরাসরি বিশ্লেষণ করেন।

(১০) শিক্ষার্থীরা ভাল বক্তৃতার style অনুসরণের মাধ্যমে ভবিষ্যতে ভাল বক্তা হতে পারে।

(১১) বক্তৃতা পদ্ধতির ফলে শিক্ষার্থীরা খুব দ্রুত class note নেওয়া শিখতে পারে।

(১২) এইপদ্ধতি মনঃসংযোগের অভ্যাস বৃদ্ধির সহায়ক হতে পারে।

(১৩) একটি নতুন বিষয়ের পঠন-পাঠনের পূর্বে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের উপর নীতিদীর্ঘ বক্তৃতার মাধ্যমে সমগ্র বিষয়ের উপর আলোকপাতের চেষ্টা করা হয়।

(১৪) সর্বোপরি, বক্তার বিষয়বস্তু উপস্থাপনের কৌশল, তার গলার স্বর, উচ্চারণের ভঙ্গিমা, body language-এর মাধ্যমে বক্তৃতা পদ্ধতির গুণগত মান বৃদ্ধি করা যায়।

৪.৩.২.৩ বক্তৃতা পদ্ধতির অপকারিতা (Demerits of Lecture Method) :

(১) বক্তৃতা পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীদের প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণের অবকাশ নেই। শুধুমাত্র প্রশ্নোত্তর পর্বে তাদের কৌতূহল পূরণ হতে পারে।

(২) এই পদ্ধতিতে ব্যক্তিগত বৈষম্যের নীতি গুরুত্ব পায় না; সুতরাং শ্রেণীকক্ষের প্রত্যেক শিক্ষার্থী এই পদ্ধতির দ্বারা উপকৃত না হতেও পারে।

(৩) এই পদ্ধতিতে 'Learning by doing' গুরুত্ব পায় না।

(৪) বক্তৃতার গতি ও ধরন শিক্ষার্থীদের বুদ্ধির স্তরের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ না হলে সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে।

(৫) সাধারণ মানের শিক্ষার্থীরা বক্তৃতার উপর দীর্ঘ সময় মনোযোগ দিতে পারে না; তারা ক্রমশ নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে।

(৬) বক্তৃতা পদ্ধতির মূল লক্ষ্য হল বিষয়বস্তুর উপস্থাপন; শিক্ষার্থীদের শিখনের নিশ্চয়তা থাকে না।

(৭) শিক্ষার্থীদের মধ্যে বক্তৃতা শুনতে শুনতে ক্লান্তি দেখা দিতে পারে।

(৮) এই পদ্ধতি শিক্ষার্থীদের মৌলিক বিকাশে সাহায্য করে না।

(৯) এই পদ্ধতি শিখনের মনোবিজ্ঞানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।

(১০) এই পদ্ধতির মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের জ্ঞানার্জন সন্তোষজনক হতে পারে না।

(১১) এই পদ্ধতির মাধ্যমে একসাথে প্রচুর তথ্য শিক্ষার্থীদের কাছে উপস্থাপন করা হয় ফলে তাদের মধ্যে বিভ্রান্তি দেখা দিতে পারে।

(১২) এই পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীরা সরাসরি অংশ গ্রহণ করে না; এজন্য শিক্ষার্থীদের জ্ঞানার্জন সম্পর্কিত মূল্যায়ন অত্যন্ত কঠিন।

৪.৩.৩ আরোহ ও অবরোহ পদ্ধতি (Inductive and Deductive Method) :

সমগ্র শিক্ষণ প্রক্রিয়ায় আরোহ ও অবরোহ পদ্ধতির গভীর প্রভাব দেখা যায়। বস্তুতপক্ষে, এই দুই পদ্ধতির প্রয়োগ ব্যতীত শ্রেণী শিক্ষণের ধারণা অসম্পূর্ণ থাকে।

৪.৩.৩.১ আরোহ পদ্ধতি (Inductive Method) :

আরোহ পদ্ধতিকে 'method of development' পদ্ধতি বলা হয়। পাঠ্যবিষয়ের সাথে সম্পর্কযুক্ত বহুবিধ উদাহরণ শিক্ষার্থীদের কাছে উপস্থাপন করা হয়। শিক্ষার্থীরা ধীরে ধীরে উদাহরণগুলির পরীক্ষানিরীক্ষার মাধ্যমে সাধারণ সূত্র নির্মাণে উদ্যোগী হয়। অর্থাৎ তারা নিজেরাই সাধারণ সূত্র বা সাধারণ বিবৃতির বিকাশ ঘটায়। এই পদ্ধতি প্রয়োগের স্তরগুলি হল :

(১) উদাহরণগুলির পর্যবেক্ষণ,

(২) উদাহরণগুলির সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্যের পৃথকীকরণ এবং বিশ্লেষণ,

(৩) শ্রেণী বিভক্তিকরণ,

(৪) বিমূর্তকরণ ও সাধারণীকরণ

(৫) প্রয়োগ ও সত্যতা নিরূপণ।

সুতরাং আরোহী পদ্ধতির ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীরা তথ্যের বিশেষ বিশেষ বৈশিষ্ট্যগুলির পর্যবেক্ষণ, সাদৃশ্য-বৈশাদৃশ্য চিহ্নিত ও শ্রেণী বিভাগের মাধ্যমে সাধারণ সূত্র নির্মাণ করে।

৪.৩.৩.২ আরোহ পদ্ধতির সুবিধা (Merits of Inductive Method) :

(১) এই পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীদের প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণের সুযোগ থাকে।

(২) এই পদ্ধতি 'কাজের মাধ্যমে শিক্ষার' প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

(৩) এই পদ্ধতি প্রয়োগের ফলে শিক্ষার্থীদের কাছে পাঠের বিষয় খুবই আগ্রহের এবং চ্যালেঞ্জ রূপে দেখা দেয়।

(৪) শিক্ষার্থীরা পড়াশুনা সংক্রান্ত সমস্যা সমাধানে আগ্রহ ও উৎসাহ লাভ করে।

(৫) শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন তথ্যের পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষণের মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের উপায় নির্ধারণ ও সিদ্ধান্তে উপনীত হবার মানসিক দৃঢ়তা লাভ করে।

(৬) এই পদ্ধতি প্রয়োগের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা স্বশিক্ষা লাভের প্রেরণা পায়। ফলে তাদের আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পায়।

(৭) আরোহ পদ্ধতি শিক্ষার মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

৪.৩.৩.৩ আরোহ পদ্ধতির অসুবিধা (Demerits of Inductive Method) :

(১) আরোহ পদ্ধতির মাধ্যমে পঠন-পাঠন দ্রুত গতিতে পরিচালনা করা যায় না; কারণ এই পদ্ধতির প্রতিটি স্তর বিশেষভাবে ও মনোযোগ সহকারে অনুধাবন করতে না পারলে ভুল সিদ্ধান্তে উপনীত হবার সম্ভাবনা থাকে।

(২) এই পদ্ধতি সময় সাপেক্ষ।

(৩) জটিল বিষয়ের আলোচনা ও সাধারণ সূত্র নির্মাণের ক্ষেত্রে আরোহ পদ্ধতি ফলদায়ক নয়।

(৪) উপযুক্ত শিক্ষকের অভাবে এই পদ্ধতির যথার্থ প্রয়োগ সম্ভব নয়।

(৫) আরোহ পদ্ধতি একককভাবে স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়; কারণ তথ্যের পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে সাধারণ সূত্র নির্মাণ সম্ভব হলেও সেই সূত্রের গ্রহণযোগ্যতা প্রমাণের জন্য বাস্তবে সেই সূত্রের প্রয়োগ করতে হয়। অর্থাৎ আরোহ পদ্ধতির মাধ্যমে প্রাপ্ত সূত্রের গ্রহণযোগ্যতা ও সত্যতা প্রমাণের জন্য অবরোহ পদ্ধতির সাহায্য গ্রহণ করতে হয়।

৪.৩.৩.৪ অবরোহ পদ্ধতি (Deductive Method) :

আরোহ পদ্ধতির বিপরীত পদ্ধতি হল অবরোহ পদ্ধতি; কারণ আরোহ পদ্ধতির ক্ষেত্রে বিভিন্ন উদাহরণ থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে 'সাধারণ সূত্র' নির্মাণ করা হয়। কিন্তু অবরোহ পদ্ধতির ক্ষেত্রে প্রথমে 'সাধারণ সূত্র' উপস্থাপন করা হয়; পরে বিভিন্ন তথ্য এবং উদাহরণের মাধ্যমে সাধারণ সূত্রের প্রমাণ প্রতিষ্ঠা করা হয়।

উদাহরণ : 'অধিকার ও কর্তব্য পরস্পর পরিপূরক'। এই সাধারণ সূত্র নিম্নলিখিত উদাহরণের সাহায্যে প্রমাণ করা যায়;—

(১) যে কোনো ব্যক্তির যোগ্যতা প্রমাণের মাধ্যমে শিক্ষকতার পেশা গ্রহণ ও বেতন লাভের অধিকার আছে; এক্ষেত্রে তার করণীয় কর্তব্য হল দায়িত্বশীলতার সাথে শিক্ষার্থীদের পাঠদানে সবরকম পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

(২) বিভিন্ন উৎসব ও অনুষ্ঠানে আনন্দ করার অধিকার প্রত্যেকের আছে; এক্ষেত্রে কর্তব্য হল প্রতিবেশী মানুষের শান্তি বিঘ্নিত না করা।

এই দুই উদাহরণের ভিত্তিতে বলা যায় 'অধিকার ও কর্তব্য পরস্পর পরিপূরক ধারণা'।

৪.৩.৩.৫ অবরোহ পদ্ধতির সুবিধা (Merits of Deductive Method) :

(১) এই পদ্ধতি সময় সাশ্রয়কারী।

(২) এই পদ্ধতির ক্ষেত্রে শিক্ষক সাধারণ সূত্রের উল্লেখ করেন, শিক্ষার্থীরা সাধারণ সূত্রের পর্যালোচনা করে।

(৩) প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি তুলনামূলকভাবে বেশী কার্যকর। কারণ ছোট বয়সে আরোহ পদ্ধতির সফল প্রয়োগ খুবই শক্ত।

(৪) ভুল ও অসম্পূর্ণ সিদ্ধান্তে উপনীত হবার সম্ভাবনা থাকে না।

৪.৩.৩.৬ অবরোহ পদ্ধতির অসুবিধা (Demerits of Deductive Method) :

(১) শিক্ষার্থীদের স্বশিক্ষা গুরুত্ব পায় না।

(২) মুখস্থ বিদ্যার উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়।

(৩) এই পদ্ধতি মনোবিজ্ঞানসম্মত নয়।

(৪) শিক্ষার্থীদের শিখন প্রক্রিয়ায় প্রেরণা ও আগ্রহের অভাব দেখা দিতে পারে।

৪.৩.৪ আলোচনা পদ্ধতি (Discussion Method) :

আলোচনা পদ্ধতির মৌলিক লক্ষ্য হল পাঠ গ্রহণের বিষয়বস্তুর পদ্ধতিসম্মত আলোচনার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের শিখন সুনিশ্চিত করা। সুতরাং এই পদ্ধতি শিক্ষার্থীদের জ্ঞানমূলক বিকাশে সাহায্য করে। পাঠের বিষয়বস্তুর যুক্তিপূর্ণ বিশ্লেষণ, তুলনামূলক আলোচনা ও মূল্যায়নের পর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। অর্থাৎ আলোচনা পদ্ধতি একটি 'thoughtful process'। প্রকৃতপক্ষে, শ্রেণীকক্ষের শিক্ষার্থীদের শিখনের জন্য গভীর ভাবনা-চিন্তার সংহত এবং ঐক্যবদ্ধ রূপ আলোচনা পদ্ধতির মাধ্যমে প্রতিফলিত হয়। এই পদ্ধতিতে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর প্রত্যক্ষ অংশ গ্রহণ সুনিশ্চিতকরণের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয় নতুবা আলোচনা পদ্ধতি অর্থহীন হয়ে পড়বে।

৪.৩.৪.১ আলোচনা পদ্ধতি পরিচালনার সূত্রপাত (Management of Discussion Method) :

পাঠ্যবিষয়ের উপর আলোচনার সূত্রপাতের পূর্বে শ্রেণীকক্ষের শিক্ষকমহাশয়কে বিভিন্ন পদক্ষেপ ও সতর্কতা অবলম্বন করতে হয়। তিনি আলোচনায় নেতৃত্ব প্রদান করেন। তাঁকে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির দিকে নজর দিতে হয়;

(১) শিক্ষকমহাশয় আলোচনার বিষয় উপস্থাপন করবেন এবং আলোচনার অভিমুখ সুস্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করবেন।

(২) আলোচ্য বিষয়ের উপর শিক্ষকমহাশয় প্রাথমিক আলোকপাত করবেন।

(৩) আলোচ্য বিষয়ের সাথে সম্পর্কযুক্ত কিছু গুরুত্বপূর্ণ point তিনি ব্যাখ্যা করবেন।

(৪) আলোচ্য বিষয়ের সাথে সম্পর্কযুক্ত চার্ট, ছবি, নকশা, শ্রবণ-দর্শনভিত্তিক উপকরণ তিনি উপস্থাপন করবেন।

অতঃপর শিক্ষকমহাশয় আলোচনায় অংশগ্রহণের জন্য শিক্ষার্থীদের আহ্বান করবেন।

শিক্ষার্থীরা নিজ নিজ অভিজ্ঞতা ও ধারণার ভিত্তিতে সুন্দরভাবে আলোচ্য বিষয়ের উপর আলোকপাতের চেষ্টা করবে।

৪.৩.৪.২ আলোচনার কৌশল ও শর্ত (Techniques and Conditions of Discussion) :

আলোচনা পদ্ধতির প্রয়োগ শিক্ষকের গভীর জ্ঞান, আলোচনা পরিচালনার কৌশল এবং ধৈর্য্যের উপর নির্ভরশীল। আলোচনার সাফল্য নির্ভর করে নিম্নলিখিত কৌশল ও শর্তের উপর;—

(১) আলোচ্য বিষয়ের তাৎপর্য সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা সচেতন থাকবে।

(২) শিক্ষার্থীদের আলোচনার অংশগ্রহণের জন্য উৎসাহ দিতে হবে।

(৩) গণতান্ত্রিক পরিবেশের মধ্যে আলোচনা সুনিশ্চিত করতে হবে। প্রত্যেক শিক্ষার্থীর নিজ নিজ ভাবনা-চিন্তা নির্ভয়ে এবং নিঃসংকোচে প্রকাশের সুযোগ দিতে হবে।

(৪) প্রতিযোগিতা ও সহযোগিতার পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে।

(৫) শিক্ষার্থীদের মধ্যে দলগত সংহতি প্রতিষ্ঠার উপর জোর দিতে হবে।

(৬) আলোচনার মূল লক্ষ্যের প্রতি নজর দিতে হবে; আলোচনার প্রক্রিয়া জ্ঞানার্জনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে।

(৭) শিক্ষার্থীরা যেন একে অপরের মতামতের প্রতি সহনশীল হয়।

(৮) সুনির্দিষ্ট কিছু সংখ্যক শিক্ষার্থী যেন আলোচনা প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করতে না পারে; প্রত্যেকের অংশ গ্রহণ সুনিশ্চিত করতে হবে।

(৯) আলোচনা প্রক্রিয়ায় যেসব অপ্রাসঙ্গিক তথ্য এবং বক্তব্য উপস্থাপিত হবে, শিক্ষকমহাশয় সেগুলিকে তৎক্ষণাৎ আলোচনার প্রক্রিয়া থেকে বাদ দেবেন।

(১০) জ্ঞানের বিকাশের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ তথ্যের আলোচনার উপর গুরুত্ব দিতে হবে।

(১১) আলোচনার একটি সময়সীমা থাকবে।

(১২) আলোচনার প্রক্রিয়া শেষে আলোচ্য বিষয়ের মূল্যায়ন করতে হবে।

৪.৩.৪.৩ আলোচনা পদ্ধতির সুবিধা (Merits of Discussion Method) :

(১) আলোচনা একটি দলগত প্রক্রিয়া এর ফলে শিক্ষার্থীদের মধ্যে দলগতভাবে পাঠ্যবিষয়ের আলোচনার মাধ্যমে জ্ঞানার্জনের মানসিকতার বিকাশ ঘটে।

(২) আলোচনা প্রক্রিয়া গণতান্ত্রিক পরিবেশে পরিচালিত হয়, ফলে শিক্ষক-শিক্ষার্থী সম্পর্ক নিবিড় হয়।

(৩) শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিত্ব বিকাশের প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত হয়। কারণ, শিক্ষকমহাশয় এবং সহপাঠীদের উপস্থিতিতে নিজের ভাবনা-চিন্তা সুস্পষ্টভাবে প্রকাশের সুযোগ থাকে।

(৪) যেসব শিক্ষার্থীদের মধ্যে নেতৃত্ব প্রদানের ক্ষমতা আছে তারা আলোচনা প্রক্রিয়ায় অংশ গ্রহণের মাধ্যমে নিজের দক্ষতা প্রমাণের সুযোগ পায়।

(৫) আলোচনা প্রক্রিয়ায় অংশ গ্রহণের ফলে শিক্ষার্থীদের মধ্যে যথার্থ যুক্তিবোধের বিকাশ ঘটে; কারণ অপ্রাসঙ্গিক ও অযৌক্তিক বিষয়ের উপস্থাপন সম্ভব হলেও শিক্ষকমহাশয় তৎক্ষণাৎ তা বাতিল করেন।

(৬) শিক্ষার্থীরা একটি পাঠ্যবিষয়ের আলোচনায় যদি নিজ দক্ষতা প্রমাণ করতে না পারে তবে পরবর্তী আলোচনায় নিজের দক্ষতা প্রমাণের জন্য উদগ্রীব থাকে। এর ফলে শিক্ষার্থীদের জ্ঞানের প্রতি অনুসন্ধিৎসা বৃদ্ধি পায়।

(৭) আলোচনা প্রক্রিয়ায় অংশ গ্রহণের মাধ্যমে সহপাঠীদের মতামত ও চিন্তাধারার প্রতি শ্রদ্ধার মনোভাব জাগ্রত হয়।

(৮) আলোচনা পদ্ধতিতে 'Learning by doing'-এর প্রতিফলন দেখা যায়।

(৯) পাঠ্যবিষয়ের সাথে সম্পর্কযুক্ত যেসব 'সন্দেহ' ও 'প্রশ্ন' শিক্ষার্থীদের মনে দেখা দেয়, আলোচনার মাধ্যমে তার সমাধান সম্ভব হয়।

(১০) আলোচনা প্রক্রিয়ার সময় শিক্ষকমহাশয় মেধাবী শিক্ষার্থীদের চিহ্নিত করতে পারেন।

৪.৩.৪.৪ আলোচনা পদ্ধতির অসুবিধা (Demerits of Discussion Method) :

(১) পাঠ্যবিষয়ের প্রতিটি ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি প্রয়োগ করা যায় না।

(২) শ্রেণীকক্ষের আলোচনায় সাধারণত উচ্চ মেধাসম্পন্ন শিক্ষার্থীরা প্রাধান্য বিস্তার করে।

(৩) আলোচনা প্রক্রিয়া সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত করা সম্ভব না হলে অবাঞ্ছিত পরিস্থিতির উদ্ভব হবে।

(৪) অপ্রাসঙ্গিক যুক্তির অবতারণার ফলে আলোচনার মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ব্যাহত হতে পারে।

(৫) পাঠ্যবিষয়ের প্রকৃতি সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের অস্পষ্ট ধারণা থাকলে তাদের পক্ষে আলোচনা প্রক্রিয়ায় সঠিকভাবে অংশ গ্রহণ সম্ভব হবে না।

৪.৩.৫ আলোচনা পদ্ধতির শ্রেণীবিভাগ (Classification of Discussion Method) :

তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনা পদ্ধতি দুটি শ্রেণিতে বিভক্ত— (১) দলগত ঘরোয়া আলোচনা (informal discussion) (২) দলগত আনুষ্ঠানিক আলোচনা (formal discussion)।

দলগত ঘরোয়া আলোচনা— পূর্ব নির্ধারিত কার্যসূচী ব্যতীত শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা যখন পাঠ্যবিষয়ভুক্ত বা পাঠ্যবিষয়ের সাথে পরোক্ষভাবে সম্পর্কযুক্ত কোন বিষয়ে আলোচনা করে তখন তাকে দলগত ঘরোয়া আলোচনা বলা হয়। যেমন, খেলার পিরিয়ডে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের মধ্যে ২০১৪ বিশ্বকাপে ব্রাজিলের ব্যর্থতার কারণ সম্পর্কে আলোচনা বা জার্মানির সাফল্যের কারণ সম্পর্কিত আলোচনা। এধরনের আলোচনায় শিক্ষার্থীদের উপর বিধিনিষেধ থাকে না; তারা মুক্ত মনে তাদের মতামত দিতে পারে। শিক্ষকমহাশয়ের দায়িত্ব হল সমগ্র আলোচনা প্রক্রিয়াকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত করা এবং আলোচনার শেষে ব্রাজিলের ব্যর্থতা এবং জার্মানির সাফল্যের কারণগুলি লিপিবদ্ধ করা।

দলগত আনুষ্ঠানিক আলোচনা— যেসব আলোচনা পূর্ব নির্ধারিত রীতিনীতি ও নিয়ম অনুযায়ী পরিচালিত হয় সেগুলি দলগত আনুষ্ঠানিক আলোচনা। যেমন, প্যানেল আলোচনা, সিম্পোসিয়াম, সেমিনার, ওয়ার্কশপ বা কর্মশালা, গোল টেবিল আলোচনা ইত্যাদি।

৪.৩.৫.১ প্যানেল আলোচনা (Panel Discussion) :

শ্রেণীকক্ষে শিক্ষকের নেতৃত্বে সাধারণত ৬/৭ জন শিক্ষার্থীর একটি প্যানেল গঠন করা হয়। শিক্ষক - মহাশয় স্বয়ং সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। তিনি আলোচনায় বিষয়বস্তু ঘোষণা করেন এবং সংক্ষেপে সে বিষয়ের উপর আলোকপাত করেন। এরপর তিনি আলোচনায় অংশ গ্রহণের জন্য প্যানেলভুক্ত শিক্ষার্থীদের পর পর আহ্বান করেন। শ্রেণীর অন্যান্য শিক্ষার্থীরা শ্রোতার ভূমিকা পালন করে। প্যানেলভুক্ত সকলের বক্তব্য শেষ হবার পর তারা প্রশ্ন উত্থাপন করতে পারে। প্রশ্নোত্তর পর্ব শেষ হবার পর সভাপতি রূপে শিক্ষক -মহাশয় সমগ্র আলোচনার সারাংশ বর্ণনা করেন।

গুরুত্ব (Importance) :

(১) প্যানেল আলোচনায় অংশ গ্রহণের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা নিজেদের মৌলিক চিন্তাধারা প্রকাশের সুযোগ লাভ করে।

(২) যেসব শিক্ষার্থীদের মধ্যে নেতৃত্ব প্রদানের গুণাবলী আছে তারা প্যানেল আলোচনার মাধ্যমে নিজেদের যোগ্যতা প্রমাণ করতে তৎপর হয়।

(৩) সাধারণ শিক্ষার্থীরা ভবিষ্যতে প্যানেল আলোচনায় অংশ গ্রহণে আগ্রহী হতে পারে।

(৪) শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিত্ব বিকাশের সম্ভাবনা থাকে।

(৫) শিক্ষকমহাশয়ের দায়িত্ব হল অন্তর্মুখী প্রকৃতিসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের প্যানেল আলোচনায় অংশ গ্রহণে উৎসাহিত করা।

৪.৩.৫.২ সিম্পোসিয়াম (Symphosium) :

সিম্পোসিয়ামের অর্থ হল 'দার্শনিক কথোপকথনের জন্য সভা' (a meeting for philosophic conversation) এবং একটি বিষয়ের উপর বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির সংকলন (a collection of views on one topic)। শ্রেণীশিক্ষক সিম্পোসিয়ামের আলোচনায় সভাপতির ভূমিকা পালন করেন।

সিম্পোসিয়াম আলোচনার জন্য একটি বিষয় নির্বাচন করা হয়। একাধিক শিক্ষার্থী আলোচনায় অংশ গ্রহণ করে। নির্বাচিত বিষয়ের উপর প্রত্যেকে নিজ নিজ চিন্তাধারা ব্যক্ত করে। প্রত্যেকের আলোচনার পর প্রশ্নোত্তর পর্ব থাকে। সিম্পোসিয়ামে অংশ গ্রহণকারী প্রত্যেক শিক্ষার্থী অন্যদের প্রকাশিত চিন্তাধারার আলোকে নিজ মতামত পরিবর্তন করতে পারে। অন্যভাষায় বলা যায়, সিম্পোসিয়ামে অংশ গ্রহণের মাধ্যমে পারস্পরিক মত বিনিময়ের দ্বারা নিজের চিন্তাধারার পরিমার্জনের সম্ভাবনা থাকে।

সুবিধা (Advantage) :

(১) সিম্পোসিয়ামের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা যৌথভাবে কোন পাঠক্রম অথবা সহপাঠক্রমিক বিষয়ের উপর আলোচনা ও জ্ঞানার্জন করতে পারে।

(২) সিম্পোসিয়াম একটি গণতান্ত্রিক আলোচনা পদ্ধতি। শিক্ষার্থীরা একে অপরের মতামতের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও সহনশীল মনোভাব পোষণের শিক্ষা লাভ করে।

(৩) সিম্পোসিয়ামে অংশ গ্রহণ ও মতামত পেশের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পায়।

৪.৩.৫.৩ সেমিনার (Seminar) :

উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে সেমিনারের আয়োজন এক স্বাভাবিক বিষয়। বিভিন্ন জটিল বিষয়ের উপর বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিদের জ্ঞানগর্ভ আলোচনা থেকে শিক্ষার্থীরা উপকৃত হয়। বিদ্যালয় স্তরেও প্রয়োজন অনুসারে সেমিনার আয়োজন করা যেতে পারে।

সেমিনার সংগঠনের জন্য প্রথমে একটি বিষয় নির্বাচন করা হয়। বিষয় নির্বাচনের পর একাধিক বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিকে বক্তব্য উপস্থাপনের জন্য আমন্ত্রণ করা হয়। বিভিন্ন বিশেষজ্ঞের বক্তব্য শেষ হলে Open Session-এ প্রশ্নোত্তর পর্ব শুরু হয়। এই পর্বের শেষে সভাপতি সমগ্র আলোচনার উপর সংক্ষেপে আলোকপাত করেন।

সুবিধা (Advantage) :

(১) শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন বিষয়ে বিষেশজ্ঞদের বক্তব্য ও মতামত জানতে পারে।

(২) শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন বিষয়ের সাম্প্রতিক তথ্য এবং অগ্রগতি সম্পর্কে জানতে পারে।

(৩) শিক্ষার্থীদের মনঃসংযোগের ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।

(৪) শিক্ষার্থীদের বিশ্লেষণ ক্ষমতা, যুক্তিবোধ ও ভাবনা চিন্তার উপর সেমিনার আলোচনার প্রভাব - দেখা যায়।

৪.৩.৫.৪ ওয়ার্কশপ বা কর্মশালা (Workshop) :

ওয়ার্কশপ বা কর্মশালার মাধ্যমে একাধিক শিক্ষার্থী যৌথভাবে একটি সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করে। কর্মশালায় অংশ গ্রহণকারী সকলে যৌথভাবে একটি ইউনিট হিসেবে কাজ করে। সেজন্য কর্মশালার সদস্যরা একটি প্রাথমিক গোষ্ঠীরূপে পরিচিত হয়।

যেকোন বিষয় হাতেকলমে শেখার জন্য কর্মশালা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কর্মশালা দু-ভাবে পরিচালিত হতে পারে— (১) জ্ঞানর্জনের উদ্দেশ্যে পরিচালিত কর্মশালা, (২) কোন শিল্প কলা, প্রযুক্তি বিদ্যা, হাতের কাজসংক্রান্ত সমস্যা সমাধান এবং ভবিষ্যৎ অগ্রগতির জন্য পরিচালিত কর্মশালা।

বৈশিষ্ট্য (Feature) :

(১) কর্মশালায় একাধিক শিক্ষার্থী পরস্পরের সাথে আলোচনার দ্বারা সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করে।

(২) প্রয়োগমূলক বিষয়, প্রযুক্তিগত বিষয় এবং শিল্পকলা সম্পর্কিত বিষয়ের ক্ষেত্রে কর্মশালার ব্যাপক ভূমিকা আছে।

(৩) কর্মশালার শিবিরে অংশ গ্রহণকারী শিক্ষার্থীরা পর্যায়ক্রমে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করে।

(৪) কর্মশালায় এক বা একাধিক নেতা থাকতে পারে; কারণ সমগ্র একটি বিষয়ের বিভিন্ন অংশের সমস্যার সমাধানের দায়িত্ব একাধিক নেতার মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হয়।

(৫) কর্মশালায় অংশ গ্রহণকারী প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করতে হয়; কোন শিক্ষার্থীর পক্ষে নিষ্ক্রিয় থাকা সম্ভব নয়।

সুবিধা (Advantage) :

(১) শিক্ষার্থীরা এক স্বাধীন পরিবেশে হাতেকলমে কাজের মাধ্যমে জ্ঞানার্জন লাভ করতে পারে। বস্তুতপক্ষে, কর্মশালার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা ব্যবহারিক ও প্রয়োগিক জ্ঞান লাভ করে।

(২) কর্মশালায় শিক্ষার্থীদের দক্ষতার গুণগত বিচার বিশ্লেষণ করা হয় না; পরিবর্তে যৌথভাবে জ্ঞানার্জনের ও সমস্যা সমাধানের প্রয়াস করা হয়। সুতরাং কর্মশালায় শিখনের গণতান্ত্রিক পরিবেশ দেখা যায়।

(৩) কর্মশালায় অংশ গ্রহণকারী শিক্ষার্থীরা অভিজ্ঞ অধ্যাপকের তত্ত্বাবধানে নতুন অভিজ্ঞতা অর্জন করে।

(৪) কর্মশালার প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন বিষয়ের বিশেষজ্ঞদের তত্ত্বাবধানে শিক্ষার্থীরা কাজের সুযোগ পায়।

৪.৩.৬ প্রকল্প পদ্ধতি (Project Method) :

মার্কিন দার্শনিক ও শিক্ষাবিদ জন ডিউই-এর প্রয়োগবাদী শিক্ষা দর্শন হল প্রকল্প পদ্ধতির বৌদ্ধিক উৎস। পরবর্তী অধ্যায়ে কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ড. ডব্লু. এইচ. কিলপ্যাট্রিক ১৯১৮ সালে প্রকাশিত 'The Project Method' গ্রন্থের মাধ্যমে প্রকল্প পদ্ধতির দার্শনিক ভিত্তি দৃঢ় করেন। প্রকৃতপক্ষে, সাবেক শিক্ষা পদ্ধতির অবাস্তবতা ও প্রয়োগযোগ্যহীনতা যত বেশী প্রকট হয়েছে, নতুন শিক্ষণ পদ্ধতির প্রয়োজনীয়তা তত বেশী অনুভূত হয়েছে। এজন্য অতীতের পাঠ্যপুস্তককেন্দ্রিক ও মুখস্থ বিদ্যাভিত্তিক পদ্ধতির পরিবর্তে প্রকল্প পদ্ধতির জীবনমুখী শিক্ষা পরিকল্পনা শিক্ষক মহলে দ্রুত জনপ্রিয় হয়েছে। কারণ প্রকল্প পদ্ধতি সর্বদা জীবনমুখী সমস্যা সমাধান ও উদ্দেশ্যমূলক কার্যকলাপের উপর গুরুত্ব আরোপ করে। প্রকল্প পদ্ধতির মূল লক্ষ্য হল শিক্ষার্থীদের মধ্যে সক্রিয়তা সৃষ্টি, যার ফলে শিক্ষকের উপস্থিতিতে ও নির্দেশনায় তারা শিমন সংক্রান্ত অভিজ্ঞতা লাভ করে।

৪.৩.৬.১ বৈশিষ্ট্য (Feature) :

(১) প্রকল্প হল একটি সমস্যামূলক কাজ।

(২) প্রকল্প হল একটি উদ্দেশ্যমূলক কাজ।

(৩) প্রকল্প বাস্তব পরিবেশের মধ্যে সংগঠিত কার্যকলাপ।

(৪) প্রকল্প হল একটি সামগ্রিক কার্যকলাপ।

(৫) প্রকল্প হল প্রকৃত বাস্তব জীবনের প্রতিফলন।

(৬) প্রকল্প হল ব্যবহারিক দৃষ্টিকোণ থেকে সমস্যা সমাধানের কাজ।

(৭) প্রকল্প হল ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সমস্যা সমাধানের কাজ।

৪.৩.৬.২ প্রকল্পের বিভিন্ন স্তর (Different Stages of the Project) :

বিজ্ঞানসম্মত প্রকল্প নির্মাণ এবং সফলভাবে সম্পূর্ণ করার জন্য নিম্নলিখিত স্তরগুলি অনুসরণ করা হয়—

(১) প্রকল্পের উপযোগী পরিবেশ গঠন— শিক্ষার্থীরা স্বয়ং প্রকল্পের উপযোগী একটি সমস্যা নির্ধারণ ও বর্ণনা করবে। এক্ষেত্রে শিক্ষকের অন্যতম দায়িত্ব হল প্রকল্প অনুসারী বাস্তব ও শিক্ষামূলক পরিবেশ গঠনে শিক্ষার্থীদের পরামর্শ প্রদান করা।

(২) প্রকল্প নির্ধারণ ও উদ্দেশ্য বর্ণনা— সঠিকভাবে প্রকল্পের উদ্দেশ্য নির্ধারণ ব্যতীত শিক্ষার্থীদের জ্ঞানার্জনের উদ্দেশ্য বিফল হবে। এজন্য শিক্ষকের অন্যতম দায়িত্ব হল প্রকল্প নির্ধারণে শিক্ষার্থীদের সাথে সহযোগিতা করা।

(৩) **পরিকল্পনা রচনা—** প্রকল্প নির্ধারণে ও তার উদ্দেশ্য বর্ণনার পর সেই প্রকল্পের সাফল্যের জন্য বিজ্ঞানসম্মত পরিকল্পনা প্রয়োজন। পরিকল্পনা যত নিখুঁত হবে, সাফল্য অর্জন তত সহজ ও সুনিশ্চিত হবে। পরিকল্পনা রচনার সময় প্রত্যেক শিক্ষার্থীর মতামত গ্রহণ করা হবে। সকলের মতামত বিস্তারিতভাবে আলোচনার পর চূড়ান্ত পরিকল্পনা রচিত হয়।

(৪) **প্রকল্প রূপায়ণ—** সমগ্র প্রকল্প প্রত্যেক শিক্ষার্থীর সহযোগিতামূলক উদ্যোগের মাধ্যমে রূপায়িত হয়। প্রকল্পের সাথে যুক্ত বিভিন্ন কাজ শ্রম বিভাজন নীতির ভিত্তিতে শিক্ষার্থীদের মধ্যে বণ্টিত হয়। শিক্ষকের অন্যতম কর্তব্য হল শিক্ষার্থীদের বিভিন্নভাবে সাহায্য করা। শিক্ষার্থীদের কাছে প্রকল্পের এই পর্যায়টি সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ; কারণ দায়িত্বপালনের মাধ্যমে তারা ধীরে ধীরে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান অর্জন করে।

(৫) **মূল্যায়ন—** প্রকল্পের কাজ সম্পন্ন করার পর তার পর্যালোচনা করা হয়। এর ফলে ছোট ছোট ভুল- ভ্রান্তি চিহ্নিত করা ও তার সমাধান করা যায়। আত্মসমালোচনার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের প্রশিক্ষণ ও জ্ঞানার্জন সম্পূর্ণ হয়।

(৬) **নথিভুক্তকরণ—** প্রকল্পের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত প্রতিটি স্তরের কার্যকলাপ লিপিবদ্ধ করা হয়। প্রকল্প ডায়েরির মধ্যেই প্রকল্পের সূত্রপাত থেকে সমাধান পর্যন্ত সুন্দরভাবে নথিভুক্ত করা থাকে।

৪.৩.৬.৩ প্রকল্প পদ্ধতির উপযোগিতা/সুবিধা (Advantages of the Project Method) :

(১) প্রকল্প পদ্ধতি মনোবিজ্ঞানসম্মত; কারণ প্রকল্পের সূত্রপাত থেকে শেষ পর্যন্ত পর্যালোচনা করলে শিখনের তিনটি সূত্র— প্রস্তুতি, অনুশীলন ও ফলাফল— লক্ষ করা যায়।

(২) বাস্তব ও সামাজিক জীবনের ভিত্তির উপর প্রকল্প নির্ধারিত হয়; সেজন্য এই পদ্ধতি শিক্ষার্থীদের জীবনের সাথে সম্পর্কযুক্ত।

(৩) প্রকল্প পদ্ধতির মধ্যে শিখনের অনুবন্ধনীতির প্রতিফলন দেখা যায়।

(৪) সহযোগিতামূলক কার্যকলাপ হল প্রকল্পের সাফ্যলের শর্ত; সেজন্য গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ এবং জীবনাদর্শ সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা প্রাথমিক ধারণা লাভ করে।

(৫) প্রকল্প পদ্ধতির প্রতিটি স্তরে সহযোগিতার ধারা লক্ষ করা যায়। এর ফলে শিক্ষার্থীদের মধ্যে স্বাধীনতা, সহিষ্ণুতা ও উদার মনের পরিচয় পাওয়া যায়।

(৬) শিক্ষার্থীদের মধ্যে কাজের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের মনোভাব তৈরী হয়।

(৭) প্রকল্প পদ্ধতির মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের যে প্রশিক্ষণ শিক্ষার্থীরা লাভ করে, সেই প্রশিক্ষণ বৃহত্তর জীবনেও কাজে লাগে।

(৮) সমস্যা সমাধানের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা আত্মতৃপ্তি লাভ করে।

(৯) গঠনমূলক কাজে ব্যস্ত থাকার জন্য শিক্ষার্থীরা শৃঙ্খলাপরায়ণতার মূল্য উপলব্ধি করতে পারে।

(১০) শিক্ষার্থীরা স্বয়ং প্রকল্পের প্রতিটি কাজ সম্পাদনের সাথে যুক্ত থাকে; ফলে তারা কাজের মাধ্যমে আনন্দ লাভ করে এবং স্বাধীনতা উপভোগ করে।

৪.৩.৬.৪ প্রকল্প পদ্ধতির অসুবিধা (Disadvantages of the Project Method) :

(১) প্রকল্প পদ্ধতির উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করলে বৌদ্ধিক বিষয়ের শিখন উপেক্ষিত হবে।

(২) পাঠ্যপুস্তকের প্রতিটি বিষয়ের উপর প্রকল্প পদ্ধতি প্রয়োগ করা যায় না।

(৩) প্রকল্প পদ্ধতির সাথে বিদ্যালয়ের সময় তালিকার সামঞ্জস্য ও ভারসাম্য রক্ষা অত্যন্ত কঠিন।

(৪) প্রকল্প পদ্ধতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ পাঠ্যপুস্তকের অভাব আছে।

(৫) উচ্চমেধাসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের কাছে প্রকল্প পদ্ধতি বিরক্তির কারণ হতে পারে।

(৬) প্রকল্প পদ্ধতি প্রয়োগের দক্ষতাসম্পন্ন শিক্ষকের অভাব আছে।

(৭) এই পদ্ধতির প্রয়োগ সময়সাপেক্ষ।

৪.৩.৭ ব্যক্তিভিত্তিক নির্দেশনা (Individualised Instruction) :

আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থার শিক্ষার্থীদের শ্রেণীবিভাগ এবং বিদ্যালয়ের শ্রেণী সংগঠন অপরিহার্য বিষয়। শিক্ষা মনোবিদ্যা অনুসারে শিক্ষার্থীকে এক স্বতন্ত্র সত্তা রূপে বিবেচনা করা হয়। শিক্ষার্থীদের দৈহিক, মানসিক, সাংস্কৃতিক, সামাজিক ও বৌদ্ধিক বৈশিষ্ট্য অনুসারে শ্রেণী বিভক্তিকরণ করা প্রয়োজন। এই ধরনের শ্রেণী বিভক্তিকরণের ভিত্তিতে পৃথক নির্দেশনা প্রদানের প্রক্রিয়াকে ব্যক্তিভিত্তিক নির্দেশনা বলা হয়।

ব্যক্তিভিত্তিক নির্দেশনার লক্ষ্য হল—

(১) শিক্ষার্থীদের অন্তর্নিহিত সম্ভাবনার সর্বোচ্চ বিকাশ।

(২) শিক্ষার্থীদের গুণগত মানের উন্নয়ন সুনিশ্চিত করা।

(৩) শিক্ষা কর্মসূচীর সুযোগ বৃদ্ধি।

(৪) জীবনরূপী শিক্ষার ধারণার রূপায়ণ।

৪.৩.৭.১ অর্থ (Meaning) :

বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যক্তিভিত্তিক নির্দেশনার ধারণা বিশ্লেষণ করা হয়। সুনির্দিষ্টভাবে ব্যক্তিভিত্তিক নির্দেশনার অর্থ প্রকাশ করা অত্যন্ত শক্ত, কারণ মনোবিজ্ঞানের প্রগতিশীল গবেষণার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের শিখন সম্পর্কে বিবিধ তথ্য আবিষ্কৃত হচ্ছে; এর ফলে ব্যক্তিভিত্তিক নির্দেশনার ধারণা সম্পর্কে আমাদের অভিজ্ঞতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। ওয়াশিংটন ডিসি-তে অবস্থিত 'The Year Book Association for Supervision and Curriculum Development' প্রতিষ্ঠান ব্যক্তিভিত্তিক নির্দেশনার অর্থ প্রসঙ্গে বলেছে; achieving individualisation which effects the release of human potential has long been important function of class room teacher, অর্থাৎ শিক্ষার্থীদের অন্তর্নিহিত সম্ভাবনার বিকাশের প্রতি গুরুত্ব প্রদান করাই ব্যক্তিভিত্তিক নির্দেশনা প্রদান করা সম্ভব হলে শিক্ষার্থীর বিকাশের সম্ভাবনা সর্বোচ্চ হবে। এমনকি শিক্ষার্থীদের আগ্রহ, রুচি, সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট বিবেচনা করাও অত্যন্ত জরুরী। এভাবে শিক্ষণ নির্দেশনার কর্মসূচী গড়ে তুলতে পারলে শিক্ষার্থীরা নিজেদের সামর্থ্য ও পছন্দমত বিষয়ের শিখনে ব্যস্ত থাকবে।

৪.৩.৭.২ উদ্দেশ্য (Objective) :

(১) **অন্তর্নিহিত সম্ভাবনার সর্বোচ্চ বিকাশ—** ব্যক্তিগত নির্দেশনার মূল লক্ষ্য হল শিক্ষার্থীদের সামর্থ্যের পার্থক্যের ভিত্তিতে নির্দেশনা প্রক্রিয়ার পরিবর্তন ও পরিমার্জন করা যাতে তাদের বিকাশ সম্পর্কে সুনিশ্চিত হওয়া যায়।

(২) **গুণগতমান ও সংখ্যার সমস্যার সমাধান—** শিক্ষণ ও নির্দেশনার অন্যতম লক্ষ্য শিক্ষার্থীদের সর্বাঙ্গীন বিকাশ। কিন্তু প্রত্যেক শিক্ষার্থীর মানসিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, বৌদ্ধিক সংগঠনের মধ্যে পার্থক্য অত্যন্ত স্বাভাবিক বিষয়। এইসব বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে শিক্ষার্থীদের বিকাশের গতির মধ্যে পার্থক্য দেখা যায়। কিন্তু শিক্ষণ-শিখন প্রক্রিয়া শুধুমাত্র মেধাবী ও উৎকৃষ্ট শিক্ষার্থীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে পারে না; সাধারণ মানের শিক্ষার্থীদের জন্যও রাষ্ট্র বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করে। ব্যক্তিভিত্তিক নির্দেশনার লক্ষ্যই হল উভয় প্রকার শিক্ষার্থীদের পৃথক পৃথকভাবে শিক্ষণের এবং নির্দেশনার ব্যবস্থা গ্রহণ। বাস্তবসম্মত ও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের দ্বারা ''সংখ্যাগত ও'' ''গুণগত'' সমস্যার সমাধান সম্ভব।

(৩) **সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা—** শিক্ষণ নির্দেশনার ধারণা প্রয়োগের মাধ্যমে প্রত্যেক নাগরিকের জন্য প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচী বাধ্যতামূলকভাবে রূপায়ণের চেষ্টা করা হয়।

(৪) **শিক্ষা কর্মসূচীর সুযোগ বৃদ্ধি—** প্রথাবহির্ভূত শিক্ষা, দূরশিক্ষা ইত্যাদি ব্যবস্থাকে কার্যকর করা, বিভিন্ন দপ্তরের কর্মীদের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা ইত্যাদি ব্যক্তিভিত্তিক নির্দেশনার অন্তর্ভুক্ত।

(৫) **জীবনব্যাপী শিক্ষার ধারণার রূপায়ণ—** বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার অভাবনীয় উন্নতির ফলে মানুষের সামনে যে জ্ঞানভাণ্ডার ক্রমশ উন্মুক্ত হচ্ছে, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ শিক্ষার্থীদের কাছে তাকে সহজলভ্য ও গ্রহণযোগ্য করে তুলতে হবে। এভাবেই জীবনব্যাপী শিক্ষার ধারণা আমাদের কাছে অর্থপূর্ণ হতে পারে।

৪.৩.৭.৩ বৈশিষ্ট্য (Feature) :

বিগত ২/৩ দশক যাবৎ ব্যক্তিভিত্তিক নির্দেশনার উপর ধারাবাহিক গবেষণা অব্যাহত আছে। এর ফলে নির্দেশনার কৌশলের মধ্যে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সূচনা হয়েছে। ব্যক্তিভিত্তিক নির্দেনার বৈশিষ্ট্যগুলি হল—

(১) এই নির্দেশনার প্রক্রিয়ার ফলাফল চিহ্নিত করা হয়; অর্থাৎ আচরণগত পরিবর্তনের পর্যবেক্ষণ এবং পরিমাপ করা যায়।

(২) নির্দেশনায় অংশগ্রহণের পূর্বে শিক্ষার্থীর আচরণের পরিমাপ করা হয়।

(৩) শিক্ষার্থীর প্রয়োজন, আগ্রহ ও দক্ষতা অনুসারে নির্দেশনার প্রক্রিয়া পরিচালিত হয়।

(৪) নির্দেশনার উদ্দেশ্য ও প্রক্রিয়া শিক্ষকের পরিবর্তে শিক্ষার্থীদের আগ্রহের ভিত্তিতে নির্ধরিত হয়।

(৫) শিক্ষার্থী সক্রিয়ভাবে শিক্ষণের প্রক্রিয়ায় অংশ গ্রহণ করে এবং নির্দেশনার সাথে সামঞ্জস্য রেখে শিক্ষকের প্রশ্নের উত্তর দেয়।

(৬) শিক্ষার্থীকে তার সাফল্যের ফলাফল সম্পর্কিত তথ্য প্রতি মুহূর্তে প্রদান করা হয়। প্রাপ্ত তথ্য শিক্ষার্থীকে অনুপ্রাণিত করে।

(৭) শিক্ষার্থীর নিজের বৌদ্ধিক স্তরের উপর শিখনের গতি নির্ভর করে। কিন্তু সেই গতি বৃদ্ধির জন্যই বিজ্ঞানসম্মত নির্দেশনা multi media-র ব্যবহার হয়। শিক্ষার্থীর বৈশিষ্ট্য এবং শিখনের উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে multi media-র নির্বাচন করা হয়।

৪.৩.৭.৪ সুবিধা (Advantage) :

(১) শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য ও বৌদ্ধিক স্তরের উপর সুবিচার করা হয়।

(২) ব্যক্তিগত বৈষম্যের নীতির উপর গুরুত্ব প্রদান করা হয়।

(৩) এই পদ্ধতি মনোবিজ্ঞানসম্মত।

(৪) শিক্ষার্থীদের মধ্যে সহযোগিতা ও শৃঙ্খলাপরায়ণতার মনোভাব সৃষ্টি হয়, এবং

(৫) শিক্ষাব্যবস্থার সামগ্রিক উন্নতির সম্ভাবনা থাকে।

৪.৩.৭.৫ অসুবিধা (Disadvange) :

(১) পাঠ্যসূচীর প্রতিটি অধ্যায়ের শিক্ষণের ক্ষেত্রে এই নির্দেশনার ধারণা প্রয়োগ করা প্রায় অসম্ভব।

(২) মেধাবী এবং সাধারণ শিক্ষার্থীদের মধ্যে ব্যবধান তৈরী হয়।

(৩) এই নির্দেশনা পদ্ধতি অত্যন্ত সময়সাপেক্ষ।

৪.৩.৮ কম্পিউটারভিত্তিক নির্দেশনা (Computer Assisted Instruction) :

প্রোগ্রাম নির্দেশনার নীতির স্বাভাবিক ফলশ্রুতি রূপে কম্পিউটারভিত্তিক নির্দেশনা (Computer Assisted Instruction)-র উদ্ভব হয়েছে। শিক্ষার্থীর শিখনের প্রক্রিয়া সহজ ও সরল করাই হল এই বিশেষ নির্দেশনার লক্ষ্য। ১৯৬১ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইলিনয়েস বিশ্ববিদ্যালয়ে Programmed Logic for Automatic Teaching Operation (PLATO) তৈরীর মাধ্যমে সর্বপ্রথম কম্পিউটারভিত্তিক নির্দেশনা ব্যবহারের সূত্রপাত হয়।

৪.৩.৮.১ সুবিধা (Advantage) :

(১) কম্পিউটারভিত্তিক নির্দেশনা ব্যবহারের ফলে শিখনের গতি ও হার বৃদ্ধি পায়,

(২) এই নির্দেশনা পদ্ধতি সাবেক পদ্ধতি অপেক্ষা ভাল।

(৩) এই নির্দেশনার মাধ্যমে বিষয়বস্তু যখন শিক্ষার্থীর সামনে উপস্থাপন করা হয় তখন তাদের মধ্যে শিখনের প্রতি ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির উদয় হয়।

(৪) এই পদ্ধতির মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা যে নির্দেশনা লাভ করে তার ফলে তাদের মধ্যে শিখনের প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি পায়।

(৫) এই নির্দেশনা শিখনের প্রতি শিক্ষার্থীদের অনুরাগ সৃষ্টি করে। কারণ এই নির্দেশনা পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীরা নিজ নিজ শিখনের গতি অনুযায়ী বিদ্যা লাভ করে; এবং

(৬) এই নির্দেশনার মধ্যে যেসব প্রোগ্রাম যুক্ত থাকে, সেগুলির মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা তাদের প্রতিক্রিয়ার ফলাফল জানতে পারে। অর্থাৎ শিক্ষার্থীরা ফিডব্যাক পদ্ধতির মাধ্যমে নিজ নিজ শিখনের ফলাফল বিশ্লেষণ করতে পারে।

৪.৩.৮.২ অসুবিধা (Disadvantage) :

(১) ভারতের ন্যায় রাষ্ট্রে এই নির্দেশনার পদ্ধতি প্রয়োগ অত্যন্ত ব্যয় বহুল।

(২) এই নির্দেশনার জন্য প্রয়োজনীয় 'প্রোগ্রাম' তৈরী করা সহজ কাজ নয়। এক্ষেত্রে দক্ষ কর্মীর অভাব আছে, এবং

(৩) পাঠ্যসূচীর প্রতিটি বিষয়ের ক্ষেত্রে এই নির্দেশনা সমানভাবে প্রয়োগ করা যায় না।

৪.৩.৯ রাষ্ট্রবিজ্ঞান কক্ষ (Political Science Room) :

শিমনের সাথে পরিবেশের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। শিখন সহায়ক পরিবেশে শিক্ষার্থীর শিখনের মাত্রা বৃদ্ধি পায়। এজন্য বিদ্যালয়ের প্রতিটি বিষয়ের জন্য বিষয়ভিত্তিক শ্রেণীকক্ষ গঠন করা প্রয়োজন। বিষয়ভিত্তিক শ্রেণীকক্ষ গড়ে তোলার মূল লক্ষ্য হল শিক্ষার্থীকে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের প্রতি আকৃষ্ট করা। এই দার্শনিক চিন্তাধারার প্রেক্ষাপটে রাষ্ট্রবিজ্ঞান শ্রেণীকক্ষ গঠন করা হয়।

৪.৩.৯.১ রাষ্ট্রবিজ্ঞান শ্রেণীকক্ষের উপকরণ (Materials of Political Science Room) :

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের শ্রেণীকক্ষে শিক্ষণের জন্য বিভিন্ন উপকরণ প্রয়োজন। এইসব উপকরণের সাহায্যে শিক্ষার্থীরা ব্যবহারিক দৃষ্টিকোণ থেকে রাষ্ট্রবিজ্ঞান শিখনের অনুপ্রেরণা লাভ করে। গুরুত্বপূর্ণ উপকরণগুলি হল—

(১) একটি ছোট গ্রন্থাগার গঠন করতে হবে। এই গ্রন্থাগারে গুরুত্বপূর্ণ রেফারেন্স বই, সাময়িক পত্র/পত্রিকা, দৈনিক সংবাদপত্র ইত্যাদি থাকবে।

(২) বুলেটিন বোর্ড রাখতে হবে; এই বোর্ডে নিয়মিত গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ঘটনার উল্লেখ করতে হবে।

(৩) রাজনৈতিক বিষয় সম্পর্কিত চার্ট, ম্যাপ, মডেল রাখতে হবে।

(৪) বিভিন্ন রাষ্ট্রের জাতীয় পতাকা সংরক্ষণ করতে হবে।

(৫) সময় তালিকা সম্পর্কে অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ঘটনার উল্লেখসহ সময় তালিকা দেওয়ালে ঝুলিয়ে রাখতে হবে। যেমন গ্রিসের পেলোপন্নেসীয় যুদ্ধ থেকে শুরু করে প্লেটো, অ্যারিস্টটলের অবদান ও বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলীর উল্লেখসহ সময় তালিকা রাখা যেতে পারে। এর ফলে যে ঐতিহাসিক পরিস্থিতিতে গ্রিসে রাষ্ট্র ও রাজনীতি বিষয়ক আলোচনার সূত্রপাত হয়, সে সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা সংহত ধারণা লাভ করতে পারবে। আবার ভারতের জাতীয় কংগ্রেস গঠনের সময় থেকে শুরু করে স্বাধীনতা সংগ্রামের গতি প্রকৃতির এক সংহত চিত্র দেখতে পাবে।

(৬) রাজ্য সরকার, কেন্দ্র সরকার ও জাতিপুঞ্জের ন্যায় আন্তর্জাতিক সংস্থার দ্বারা প্রকাশিত রাষ্ট্র, সমাজ, রাজনীতি সম্পর্কিত বিভিন্ন পত্র/পত্রিকার সংরক্ষণ করতে হবে।

(৭) কম্পিউটার এবং ইন্টারনেটের সংযোগ রাখতে হবে।

(৮) ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন ঘটনার 'Light and Sound System' সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করতে হবে। যেমন, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের বিভিন্ন ঘটনা, ফরাসী বিপ্লবের সাফল্য ও গণতন্ত্রের সূচনা, আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসের রাজনৈতিক তাৎপর্যের Light and Sound System শিক্ষার্থীদের মনে গভীর রেখাপাত করবে।

(৯) রাষ্ট্রবিজ্ঞান শ্রেণীকক্ষ সংলগ্ন একটি ছোট মিউজিয়াম গড়ে তুলতে হবে।

(১০) পৌরজীবন ও রাজনৈতিক বিষয়ের উপর ক্ষেত্র পরিদর্শন (field work) ও সর্বেক্ষণের (Supervision) জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ রাখতে হবে।

৪.৪ সারাংশ (SUMMARY) :

এই এককের আলোচনার মাধ্যমে রাষ্ট্রবিজ্ঞান শিক্ষণ পদ্ধতির ঐতিহাসিক বিকাশ, অর্থ, শ্রেণীবিভাগের উপর আলোকপাত করা হয়েছে। শিক্ষণ পদ্ধতির বিকাশে ফ্রয়বেল, রুশো, হারবার্ট প্রমুখ শিক্ষাবিদদের অবদান আলোচনা করা হয়েছে। এর পাশাপাশি প্রতিটি পদ্ধতির সুবিধা, অসুবিধা ও তাৎপর্য গুরুত্ব সহকারে বর্ণনা করা হয়েছে। বিশেষত, প্রকল্প পদ্ধতি, ব্যক্তিভিত্তিক নির্দেশনা, কম্পিউটারভিত্তিক নির্দেশনার ব্যবহার, সুবিধা ও অসুবিধা গুরুত্ব সহকারে আলোচিত হয়েছে। সর্বোপরি, রাষ্ট্রবিজ্ঞান পঠন-পাঠনের জন্য বিশেষ কক্ষের প্রয়োজনীয়তার কথা বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের শিক্ষণ-শিখনের প্রক্রিয়ায় মিউজিয়াম ও ক্ষেত্র পরিদর্শনের ভূমিকা উল্লেখ করা হয়েছে।

৪.৫ গ্রন্থসূচী (BIBLIOGRAPHY) :

1. Mazumder, Smritikana : Methods of Teaching Political Science.
2. Yadav, Nirmal : Teaching of Civics and Political Science.
3. Deshmukh, R.K. : Learn and Teach Political Science.
4. Chopra, J.K. : Teaching of Political Science.
5. Bhatia, K.K. : Teaching of Social Studies and Civics.
6. Agarwal, J.C. : Teaching of Social Studies.

৪.৬ আত্মসংশোধন প্রশ্ন (SELF CHECK QUESTION) :

(১) বক্তৃতা পদ্ধতির অর্থ এবং উপযোগিতা আলোচনা করুন।

(২) একটি উন্নত শিক্ষণ পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য আলোচনা করুন।

(৩) আরোহ এবং অবরোহ পদ্ধতির সুবিধার তুলনামূলক আলোচনা করুন।

(৪) আরোহ পদ্ধতি কি স্বয়ংসম্পূর্ণ? যুক্তি সহকারে আলোচনা করুন।

(৫) আলোচনা পদ্ধতির অর্থ লিখুন। এই পদ্ধতি প্রয়োগের কৌশলগত শর্তগুলির আলোচনা করুন।

(৬) আলোচনা পদ্ধতি গ্রহণের পক্ষে কী কী যুক্তি দেওয়া হয়? ব্যাখ্যা কর।

(৭) আলোচনা পদ্ধতির গুণগত মান উন্নয়নের জন্য আপনি কী কী পরামর্শ দেবেন?

(৮) কর্মশালা-র উপর টীকা লিখুন।

(৯) প্রকল্প পদ্ধতি গ্রহণের পক্ষে আপনার যুক্তি দিন।

(১০) প্রকল্প পদ্ধতির সাফল্যের শর্ত আলোচনা করুন।

(১১) ব্যক্তিভিত্তিক নির্দেশনার প্রয়োজনীয়তা আছে কি? আপনার উওরের পক্ষে যুক্তি দিন।

(১২) কম্পিউটারভিত্তিক নির্দেশনার অর্থ, সুবিধা ও অসুবিধা আলোচনা করুন।

রাষ্ট্রবিজ্ঞান পাঠ্যপুস্তকের বৈশিষ্ট্য

(FEATURES OF POLITICAL SCIENCE BOOK)

৫.১ উদ্দেশ্য (Objective)

শিখনের ক্ষেত্রে পাঠ্যপুস্তক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ। বস্তুতপক্ষে, আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থায় পাঠ্য পুস্তককে কেন্দ্র করে শিক্ষণ-শিখনের প্রক্রিয়া আবর্তিত হয়। কিন্তু মনে রাখতে হবে জ্ঞান আহরণের জন্য পাঠ্য পুস্তক একমাত্র উপকরণ নয়। শিক্ষার বিস্তারে পাঠ্যপুস্তকের ভূমিকা সম্পর্কে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। প্রকৃতপক্ষে পাঠ্যপুস্তক ব্যতীত বর্তমান পৃথিবীর শিক্ষাব্যবস্থার কথা ভাবা যায় না। পাঠ্যসূচী ও পাঠ্যক্রমের পরিবর্তনের সাথে সাথে নতুন পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন এক স্বাভাবিক ঘটনা। পাঠ্য পুস্তক না থাকলে শিক্ষার্থীরা শিখনের ক্ষেত্রে অসহায় বোধ করবে। আগামী দিনেও পাঠ্যপুস্তক ব্যতীত কোন শিক্ষাব্যবস্থার কথা কল্পনাও করা যায় না।

৫.২ সূচনা (Introduction)

শিক্ষণ-শিখনের সাথে পাঠ্যপুস্তকের এক ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। যদিও শিক্ষণ-শিখনের প্রক্রিয়ায় পাঠ্যপুস্তক একমাত্র উপকরণ নয়। প্রাচীন যুগে শিক্ষা ও সংস্কৃতির ধারাবাহিকতা মৌখিক পদ্ধতির মাধ্যমে পরিচালিত হত। একদিকে জ্ঞানবিজ্ঞানের উৎকর্ষতা বৃদ্ধির ফলে ছাপাখানা আবিষ্কার এবং বইয়ের প্রচলন হয়েছে, অন্যদিকে জ্ঞানের বিস্তারের সাথে সাথে পাঠ্যপুস্তক শিক্ষা ক্ষেত্রে নিজের স্থান সুনিশ্চিত করেছে। পাঠ্যপুস্তক অপরিহার্য উপকরণ। পাঠ্যপুস্তক ব্যবহার সঠিকভাবে করতে পারলে শিক্ষার্থী এবং শিক্ষাব্যবস্থার উন্নতি সুনিশ্চিত হয়। পাঠ্যপুস্তক এককভাবে স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়, রেফারেন্স বই; বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ ব্যক্তির অক্ষিজ্ঞতা, তথ্যপঞ্জী ইত্যাদির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে।

৫.৩ পাঠ্যপুস্তকের অর্থ (Meaning of Text Book)

আধুনিক অর্থ এবং প্রচলিত ধারণা অনুসারে পাঠ্যপুস্তক হল শিখনের উপকরণ যা বিদ্যালয় এবং মহাবিদ্যালয়ে নির্দেশনা প্রদানের কর্মসূচীকে সাহায্য করার জন্য ব্যবহৃত হয়। মার্কিন পাঠ্যপুস্তক প্রকাশনা সংস্থার বক্তব্য হল—'a true text book is one especially prepared for the use of pupil and teacher in a school or a class, presenting a course of study in a single subject, or closely related subject.'। সুতরাং বলা যেতে পারে, পাঠ্যপুস্তকে বিশেষজ্ঞদের দ্বারা সতর্কভাবে করা হয় যা শ্রেণী কক্ষ শিখনের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়।

৫.৩.১ পাঠ্যপুস্তকের মূল কাজ (Functions of Text Book)

(i) পাঠ্যপুস্তকের কাজ হল, পাঠের বিষয়বস্তু ছাপার অক্ষরে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের কাছে উপস্থাপন করা।

(ii) শিক্ষণ সম্পর্কিত পূর্ব নির্ধারিত লক্ষ্যে উপনীত হতে পাঠ্যপুস্তক সাহায্য করে।

(iii) পাঠ্যপুস্তক পূর্ব নির্ধারিত পাঠ্যসূচীকে কেন্দ্র করে লিখিত হয়; ফলে শিক্ষার্থীদের পক্ষে পরীক্ষার প্রস্তুতি গ্রহণে সাহায্য করে।

(iv) পাঠ্যপুস্তক শিক্ষার্থীকে শ্রেণীশিক্ষণ সম্পর্কিত পরিকল্পনা রচনা করতে সাহায্য করে।

(v) পাঠ্যপুস্তক শিক্ষার্থীকে শিখনের ক্ষেত্রে পথ নির্দেশ দেয়।

(vi) পাঠ্যপুস্তক স্বশিক্ষায় সাহায্য করে, এবং

(vii) পাঠ্যপুস্তক হল জ্ঞানের ভাণ্ডার যা শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন তথ্য সরবরাহ করে।

৫.৩.২ পাঠ্যপুস্তকের ত্রুটি (Demerits of Text Book)

(i) পাঠ্যপুস্তক শিক্ষার সমগ্র প্রক্রিয়ার উপর প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করে। পঠন-পাঠনের বিভিন্ন স্তরে পাঠ্যপুস্তকের আধিপত্য লক্ষ করা যায় যা অত্যন্ত ক্ষতিকারক।

(ii) পাঠ্যপুস্তক শিক্ষার্থীদের কাছে পরীক্ষার প্রস্তুতির সহায়তা হলেও পাঠ্যপুস্তককেন্দ্রিকে পড়াশুনা ত্রুটিমুক্ত নয়।

(iii) শিখনের নতুন পদ্ধতি প্রয়োগের পথে পাঠ্যপুস্তক অন্তরায় সৃষ্টি করে; কারণ পাঠ্যপুস্তকে সবই রেডিমেড পাওয়া যায়।

(iv) বিশেষজ্ঞদের মতে পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু সরল মনে বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা গ্রহণ করে। এর ফলে নির্দিষ্ট মতবাদে বিশ্বাসী ব্যাক্তিগত তাদের মতামত প্রচারের জন্য পাঠ্যপুস্তককে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করতে পারে যা অত্যন্ত বিপজ্জনক।

৫.৩.৩ রাষ্ট্রবিজ্ঞান পাঠ্যপুস্তকের বৈশিষ্ট্য (Features of Political Science Text Book) :

সমাজবিজ্ঞানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শাখা হল রাষ্ট্রবিজ্ঞান। রাষ্ট্র ও সরকার সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্য আমরা রাষ্ট্রবিজ্ঞানের পাঠ্যপুস্তক থেকে সংগ্রহ করি। কল্পনা নির্ভর তথ্য ও বিশ্লেষণ অপেক্ষা প্রকৃত তথ্য ও বস্তুনিষ্ঠ বিশ্লেষণের ভিত্তিতে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের পাঠ্যপুস্তক রচিত হলে শিক্ষার্থীরা প্রকৃত ঘটনা সঠিকভাবে জানতে পারবে। বর্তমানে আচরণবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে অর্থাৎ Value neutral perspective থেকে পাঠ্যপুস্তক রচনার প্রবণতা লক্ষ করা যায়।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের পাঠ্যপুস্তকের নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি অতীব গুরুত্বপূর্ণ ঃ-

(i) নামকরণ — পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তুর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ একটি নাম নির্ধারণ করা প্রয়োজন।

(ii) বিষয়বস্তু নির্বাচন — যে শ্রেণীর জন্য পাঠ্যপুস্তক রচনা করা হবে সেই শ্রেণীর পাঠ্যসূচী অনুসরণ করতে হবে। অর্থাৎ পাঠ্যসূচীর প্রতিটি বিষয়ের উপর যথেষ্ট আলোকপাত করা প্রয়োজন যাতে শিক্ষার্থীরা বিষয়টি সুন্দরভাবে উপলব্ধি করতে পারে। মনে রাখতে হবে যে পাঠ্যপুস্তকে সর্বদা সর্বজনগ্রাহ্য এবং বিশ্বাসযোগ্য তথ্যের উল্লেখ থাকবে। এমনকি তথ্যের উৎস উল্লেখ করা প্রয়োজন।

(iii) বিষয়বস্তুর সংগঠন — পাঠ্যসূচীর বিষয়বস্তুকে একাধিক ইউনিট এবং সাব-ইউনিটে বিভক্ত করা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের প্রয়োজন এবং পরীক্ষার ব্যবস্থার দিকে যথেষ্ট নজর দিতে হবে। প্রত্যেকটি ইউনিটের মধ্যে সামঞ্জস্য বজায় রাখা জরুরী।

(iv) বিষয়বস্তুর উপস্থাপন — প্রত্যেকটি অধ্যায়ের নামকরণ প্রয়োজন। এর ফলে প্রত্যেকটি অধ্যায়ের অন্তর্ভুক্ত আলোচ্য বিষয় সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা ধারণা তৈরী করতে পারবে। বিষয়বস্তুর উপস্থাপনা মনোবিজ্ঞান সম্মত হবে। অর্থাৎ উপস্থাপনার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের উৎসাহ, উদ্দীপনা, ও প্রেষণা বৃদ্ধির দিকে নজর দিতে হবে। এমনকি উপস্থাপনার মধ্যে সৃষ্টিশীলতার বৈশিষ্ট্য নিহিত থাকবে।

(v) ভাষা ব্যবহার — সহজ, সরল ও চলিত ভাষার পাঠ্যপুস্তক রচনার প্রবণতা লক্ষ করা যায়। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও এই ধারণা প্রয়োগ করা যেতে পারে, তবে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের নিজস্ব কিছু শব্দভাণ্ডার আছে যেগুলি বাংলায় তর্জমা করার সময় বিভিন্ন অসুবিধা দেখা যায়। এরকম পরিস্থিতিতে বাংলা ভাষায় তর্জমার সাথে সাথে বন্ধনীর মধ্যে ইংরেজী শব্দ বা বাক্যটি উল্লেখ করা যেতে পারে। সঠিক বানান এবং ছোট ছোট বাক্য গঠন করা প্রয়োজন। ভাষার ব্যবহার যেন সুখপাঠ্য হয়।

(vi) ছবি, তালিকা, গ্রাফ ইত্যাদির ব্যবহার— পাঠ্যবিষয়ের যথাযথ বিশ্লেষণের জন্য পাঠ্যপুস্তকে ছবি, তালিকা, গ্রাফ, ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়। অত্যন্ত সতর্কতার সাথে এগুলি ব্যবহার করতে হবে। এগুলি ব্যবহারের দ্বারা পাঠ্যবিষয় শিক্ষার্থীদের কাছে প্রাঞ্জল করাই মূল লক্ষ্য; বিষয়বস্তু যেন শিক্ষার্থীদের কাছে ভারাক্রান্ত না হয়।

(vii) প্রকল্প ও অনুশীলনী— পাঠ্যপুস্তকের প্রত্যেকটি অধ্যায়ের শেষে অনুশীলনের জন্য বিভিন্ন প্রশ্ন লিপিবদ্ধ করা হয়। এইসব প্রশ্নের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর অর্জিত জ্ঞানের পরীক্ষা করা হয়। সুতরাং প্রশ্নের মাধ্যমে বিষয়গত ও বিষয়ীগত ধ্যান ধারণা পরীক্ষার ব্যবস্থা রাখতে হবে। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিষয়বস্তুর সাথে যেহেতু আমাদের পৌরজীবনের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক আছে সেহেতু অনুশীলনের প্রশ্নের মধ্যে তার প্রতিফলন থাকা দরকার। এমনকি, প্রকল্প গঠন সংক্রান্ত নির্দেশিকার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা প্রকল্প রচনা ও তার প্রয়োগ করতে সক্ষম হবে।

(viii) প্রচ্ছদ, প্রথম এবং শেষ পাতা— পাঠ্যপুস্তকের প্রচ্ছদ রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিষয়ের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে। পাঠ্যপুস্তকের নামকরণের বিষয়ে সর্তকতা অবলম্বন করা প্রয়োজন। লেখকের নাম ও পরিচিতি, প্রকাশকের নাম, প্রকশনার স্থান, প্রকশনার বছর ইত্যাদি সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে।

মুখবন্ধের মধ্যে পাঠ্যপুস্তকের আলোচ্য বিষয়ের প্রকৃতি ও পরিধির বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা থাকবে। পাঠ্যপুস্তকের একটি সূচনা থাকে। এই অংশে পাঠ্যপুস্তকটির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ব্যক্ত করতে হবে।

নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জীর (bibliography) উল্লেখ করতে হবে। আগ্রহী পাঠক ভবিষ্যতে নিজেকে সমৃদ্ধ করার উদ্দ্যেশ্য সেইসব বই পড়তে পারবে। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের নিজস্ব কিছু শব্দভাণ্ডার আছে। পাঠ্যপুস্তকে ব্যবহৃত সেইসব শব্দের উল্লেখ এবং ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন। সব শেষে শব্দসূচীর (index) তালিকা নথিভুক্ত করতে হবে। শব্দসূচী (index) ব্যবহারের দ্বারা নির্দিষ্ট একটি বিষয় দ্রুত খুঁজে পাওয়া সম্ভব হয়।

পাঠ্যপুস্তকের এইসব অ্যাকাডেমিক বিষয়ের পাশাপাশি, পাঠ্যপুস্তকের সাইজ, বাঁধাই, ছাপা এবং মূল্য সম্পর্ক বস্তুনিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করতে হবে।

৫.৩.৪ পাঠ্যপুস্তক কি অপরিহার্য? (Is Text Book Compulsory?) :

আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থার সাথে পাঠ্যপুস্তকের ধারণা অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। এমন কোন পাঠ্যক্রম নেই যেখানে পাঠ্যপুস্তকের প্রয়োজন নেই। যদিও বিশেষজ্ঞদের মতে পাঠ্যপুস্তক প্রয়োজন আছে, কিন্তু শ্রেণীকক্ষের শিক্ষণ-শিখন যেন পাঠ্যপুস্তককেন্দ্রিক হয়ে না পড়ে। শিক্ষক ও অধ্যাপকের কাছে পাঠ্যপুস্তকের গুরুত্ব আছে। তাঁরা দক্ষতার সাথে পাঠ্যপুস্তক ব্যবহার করেন। তাঁদের অভিজ্ঞতা ও দূরদৃষ্টি যখন পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তুর সাথে যুক্ত হয় তখন শিক্ষার্থীদের শিখন অধিকতর ফলপ্রসূ হয়। উল্লেখযোগ্য হল, ১৯৬৪-৬৬ সালের ভারতীয় শিক্ষা কমিশন পাঠ্যপুস্তকের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেছে। কমিশনের মতে, অভিজ্ঞ শিক্ষক ও অধ্যাপকদের দ্বারা রচিত পাঠ্যপুস্তক, শ্রেণীকক্ষ শিক্ষণের ক্ষেত্রে অপরিহার্য। পাঠ্যপুস্তকের মধ্যে ব্যবহৃত চার্ট, ছবি, গ্রাফ, মানচিত্র ইত্যাদি শিক্ষার্থীদের কাছে অত্যন্ত মূল্যবান।

৫.৪ সারাংশ (Summary) :

পাঠ্যপুস্তক এমন এক উপকরণ যাকে কেন্দ্র করে শিক্ষাব্যবস্থা আবর্তিত হয়। যদিও শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নতি এবং শিক্ষার্থীদের বৌদ্ধিক জ্ঞানের প্রসারের পাঠ্যপুস্তকের পাশাপাশি বহুবিধ উপকরণের ভূমিকা আছে।

পাঠ্যপুস্তকের অর্থ, বৈশিষ্ট্য, উপকারিতা, অপকারিতা ও কার্যাবলীর উপর আলোকপাত করা হয়েছে। বিশেষত, রাষ্ট্রবিজ্ঞানের পাঠ্যপুস্তকের বৈশিষ্ট্যগুলির উপর বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। বস্তুতপক্ষে, পাঠ্যপুস্তক শিক্ষার্থীদের কাছে পথ প্রদর্শকের ভূমিকা এবং শিক্ষকের কাছে বন্ধুর ভূমিকা পালন করে।

৫.৫ গ্রন্থসূচী (Bioliography) :

1. Mazumder, Smritikana : Methods of Teaching Political Science.
2. Yadav, Nirmal : Teaching of Civics and Political Science.
3. Deshmukh, R.K. : Learn and Teach Political Science.
4. Chopra, J.K. : Teaching of Political Science.
5. Bhatia, K.K. : Teaching of Social Studies and Civics.
6. Agarwal, J.C. : Teaching of Social Studies.

৫.৬ আত্মসংশোধন প্রশ্ন (Self Check Question) :

১) পাঠ্যপুস্তকের অর্থ ও বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করুন।

২) আপনার মতে পাঠ্যপুস্তক কি অপরিহার্য? — আলোচনা করুন।

৩) পাঠ্যপুস্তকের কাজ ব্যাখ্যা করুন।

৪) পাঠ্যপুস্তকের উপযোগিতা ও অপকারিতা ব্যাখ্যা করুন।

UNIT - 6

শিক্ষাসহায়ক উপকরণ

(TEACHINGAID)

৬.১ উদ্দেশ্য (OBJECTIVE) :

শিক্ষা প্রক্রিয়ার গতিশীল বিকাশে যেসব উপকরণ ইতিবাচক ভূমিকা পালন করে সেগুলি শিক্ষাসহায়ক উপকরণ। মানুষের পাঁচটি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা সংবেদন ও প্রত্যক্ষণের মাধ্যমেই জ্ঞানার্জনের পথ প্রশস্থ হয়। এজন্য শিক্ষকের মৌখিক বক্তব্যের সাথে শিক্ষাসহায়ক উপকরণ যেমন, চার্ট, ম্যাপ, ছবি, ত্রিমাত্রিক মডেলের কৌশলগত উপস্থাপনের দ্বারা শিক্ষার্থীদের শিখনের অভিজ্ঞতা স্থায়ী হতে পারে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে শিক্ষাসহায়ক উপকরণের ব্যবহার ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

শিক্ষার্থীদের জন্য শিখনের ব্যবস্থা করাই যথেষ্ট নয়; শিখনের গুণমান পরীক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ করা অত্যাবশ্যক। মূল্যায়ণের লক্ষ্যই হল শিক্ষার্থীদের পারদর্শিতার বিশ্লেষণ করা। পারদর্শিতার বিশ্লেষণের পরিপ্রেক্ষিতে তাদের পরবর্তী উচ্চ শ্রেণীর জন্য যোগ্য রূপে বিবেচনা করা হয়।

৬.২ সূচনা (INTRODUCTION) :

শিক্ষাসহায়ক উপকরণ ও শ্রেণী শিখন পরস্পরের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। শিক্ষাসহায়ক উপকরণ দু প্রকার — ১) প্রক্ষিপ্ত, ২) অপ্রক্ষিপ্ত। পরিস্থিতি বিচার করে এই দুই প্রকার শিক্ষাসহায়ক উপকরণ ব্যবহার হয়। পরীক্ষা ব্যবস্থার নানাবিধ সীমাবদ্ধতার পরিপ্রেক্ষিতে মূল্যায়ণ ব্যবস্থার উদ্ভব হয়েছে। মূল্যায়ণের সাথে শিক্ষণ-শিখন প্রক্রিয়া ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত। মূল্যায়ণ ব্যতীত শিক্ষার্থীদের উপর শিক্ষণ-শিখন প্রক্রিয়ার কার্যকারিতা বোঝা যায় না। এজন্য মূল্যায়ণ সম্পর্কে শিক্ষকদের প্রাথমিক ধারণা তৈরী করা অত্যন্ত জরুরী। বিভিন্ন ধরনের মূল্যায়ণ পদ্ধতি লক্ষ করা যায়।

৬.৩ শিক্ষাসহায়ক উপকরণের বৈশিষ্ট্য (Features of Teaching Aid) :

i) শিক্ষণ নির্দেশনার সাথে সম্পর্ক আছে উপকরণ ব্যবহার করতে হবে।

ii) শিক্ষক উপকরণগুলিকে যথাযথভাবে ব্যবহার করবেন।

iii) উপকরণগুলি কেন ব্যবহৃত হচ্ছে, সেবিষয়ে শিক্ষকের স্পষ্ট ধারণা থাকবে।

iv) উপকরণগুলি শিক্ষার্থীদের কাছে বোধগম্য হবে।

v) উপকরণগুলি স্পষ্ট হবে; অর্থাৎ ছবি, চার্ট, গ্রাফ, মডেল ইত্যাদি যেন অস্পষ্ট না হয়।

vi) উপকরণগুলি শিক্ষার্থীদের কাছে যেন আকর্ষণ সৃষ্টিকারী হয়।

vii) উপকরণগুলি যেন শ্রেণীকক্ষের যেকোন স্থান থেকে স্পষ্টভাবে দেখা যায়।

viii) উপকরণগুলি যেন শিক্ষার্থীদের সক্রিয়তা বৃদ্ধির সহায়ক হয়।

ix) উপকরণগুলি শিক্ষার্থীদের বয়সের এবং পরিনমনের স্তরের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়।

x) উপকরণগুলি পূর্ণব্যবহারযোগ্য ও সহজে সংরক্ষণযোগ্য হবে।

৬.৩.১ প্রক্ষিপ্ত উপকরণ (Projected Aid) :

একাধিক প্রক্ষিপ্ত উপকরণ আছে; যেমন, ফিল্ম, ফিল্মের অংশ, স্লাইড, ওভারহেড প্রোজেক্টর, এপিস্কোপ, এপিডায়াস্কোপ, গতিশীল চিত্র ইত্যাদি।

১) এপিস্কোপ - এপিস্কোপের সাহায্যে স্লাইড ও ফিল্ম স্ট্রিপ প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা হয়। এপিস্কোপ একটি সহজ যন্ত্র। এর সাহায্যে স্থির চিত্র, চার্ট, ইত্যাদি শ্রেণীকক্ষে শিক্ষার্থীদের কাছে উপস্থাপন করা যায়। প্রয়োজন অনুসারে প্রতিবিম্বের আকার ছোট / বড় করা হয়।

২) এপিডায়াস্কোপ - এপিস্কোপ ও ডায়াস্কোপের মাধ্যমে এপিডায়াস্কোপ নামে আরও একটি যন্ত্র আছে। এর কার্যপদ্ধতি এপিস্কোপের ন্যায়, তবে এই যন্ত্রে স্বচ্ছ বস্তু যেমন স্লাইড-এর প্রতিবিম্ব পর্দায় ফেলা যায়।

৩) প্রোজেক্টর - এই যন্ত্রের সাহায্যে সাদা-কালো এবং রঙীন ফিল্মের কিছু অংশ পর্দার উপর প্রতিফলিত করা হয়। প্রোজেক্টারের মাধ্যমে পাঠ্যবিষয়ের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ফিল্ম দেখানোর ব্যবস্থা করা হয়।

৪) গতিশীল চিত্র - গতিশীল চিত্র বা চিত্রের নির্বাচিত অংশে সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে শিক্ষা সহায়ক হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

৫) ওভারহেড প্রোজেক্টর - এই যন্ত্রের সাহায্যে শ্রেণীকক্ষের পিছন থেকে শিক্ষার্থীদের মাথার উপর দিয়ে তাদের সামনের দেওয়ালে বা পর্দায় কোন ছবির বড় প্রতিবিম্ব প্রতিফলিত করা যায়। এই যন্ত্রের দ্বারা অল্প দূরত্ব থেকেই বড় প্রতিবিম্ব পাওয়া যায়। শ্রেণী কক্ষে এর ব্যবহার খুবই সহজ।

৬) মাইক্রো প্রোজেক্টর - এটি এমন এক প্রোজেক্টর যার দ্বারা অণুবীক্ষণ যন্ত্রের মাধ্যমে প্রাপ্ত ছবি বড় আকারে পর্দায় প্রতিফলিত করা সম্ভব। এর ফলে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর জন্য পৃথক পৃথক অণুবীক্ষণ যন্ত্রের প্রয়োজন পড়ে না।

৬.৩.২ অপ্রক্ষিপ্ত উপকরণ (Non-Projected Aid) :

একাধিক অপ্রক্ষিপ্ত উপকরণ আছে;

১) গ্রাফিস্ক - চার্ট, নক্শা, মানচিত্র, লেখচিত্র, ফোটোগ্রাফ ইত্যাদি।

২) প্রদর্শনমূলক - ব্ল্যাকবোর্ড, ফ্লানেল বোর্ড, বুলেটিন বোর্ড, চুম্বক যুক্ত বোর্ড ইত্যাদি।

৩) ত্রিমাত্রিক নমুনা - বস্তু, মডেল, পুতুল।

৪) শ্রবণযোগ্য উপকরণ - রেডিও, টেপরেকর্ডার।

৫) দর্শনযোগ্য উপকরণ - দূরদর্শন।

৬) সক্রিয়তাভিত্তিক - শিক্ষামূলক ভ্রমণ, প্রদর্শনী, নাট্য রূপান্তর ইত্যাদি।

১) **গ্রাফিস্ক** - গ্রাফিস্ক অর্থাৎ চার্ট, চিত্র, মানচিত্র, গ্রাফ, পোস্টার, কার্টুন প্রভৃতি দ্বিমাত্রিক হয়। এগুলির ব্যবহার খুবই সহজ। পাঠ্য বিষয়ের সাথে এগুলির সম্পর্ক স্থাপন করতে পারলে শিক্ষার্থীদের সাথে পাঠ্যবিষয়ের সংযোগ সাধন অতি সহজেই সম্ভব হয়।

২) **প্রদর্শনমূলক বোর্ড** - শিক্ষার্থীদের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য প্রদর্শন বোর্ডে বিভিন্ন তথ্য উল্লেখ করা হয়। ব্ল্যাকবোর্ড শ্রেণীকক্ষের অপরিহার্য অঙ্গ। শিখনের প্রাত্যহিক কাজে শিক্ষক এই বোর্ড ব্যবহার করেন। বুলেটিন বোর্ডের মাধ্যমে সমগ্র বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। এই বোর্ডে শিক্ষা পাঠ্যক্রমের সাথে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে যুক্ত বিভিন্ন সংবাদ প্রকাশ করা হয়। চৌম্বক বোর্ড এমন এক ধরনের বোর্ড যার নীচে লোহা বা ইস্পাতের পাতলা প্রলেপ থাকে এবং উপরে পোর্সেলিনের প্রলেপ থাকে। এজন্য চক দিয়ে লেখা যায়। এছাড়া মানচিত্র, ছবি, তালিকা প্রভৃতির পিছন দিকে চৌম্বকের একাধিক পাতলা ও ছোট টুকরো আঠা দিয়ে যদি লাগিয়ে দেওয়া হয় তবে সহজেই সেগুলি চৌম্বক বোর্ডের উপর রাখা যাবে।

৩) **ত্রিমাত্রিক নমুনা** - ত্রিমাত্রিক নমুনা হিসেবে কোন বস্তু, মডেল ব্যবহার করা হয়। মডেল তিন প্রকার — ঘন বস্তু নির্মিত মডেল, X-Ray মডেল এবং বাস্তব ও কার্যকরী মডেল। বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য অত্যাবশ্যক বস্তু ঘন বস্তু দ্বারা নির্মিত ত্রিমাত্রিক মডেল আছে যার থেকে শিক্ষার্থীরা প্রাথমিক ধারণা তৈরী করতে পারে। কোন বস্তুর অভ্যন্তরীণ বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ধারণা তৈরীর জন্য X-Ray মডেল ব্যবহৃত হয়। বাস্তব ও কার্যকরী মডেলের মাধ্যমে শ্রেণীকক্ষে কোন যন্ত্রের অনুরূপ মডেল ব্যবহার করা হয়। বিদ্যুৎ সংযোগের মাধ্যমে যন্ত্রটি চালু করে শিক্ষার্থীদের কাছে যন্ত্রটির কার্যকলাপ ব্যাখ্যা করা হয়।

৪) **শ্রবণযোগ্য উপকরণ** - রেডিওতে বিভিন্ন শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান হয়। এজাতীয় অনুষ্ঠানে বারবার দেখানো হয় না; সেজন্য টেপরেকর্ডারে ধরে রাখার ব্যবস্থা গ্রহণ করলে ভবিষ্যতেও ব্যবহার করা যাবে।

৫) **দর্শনযোগ্য উপকরণ** - দূরদর্শনে একইসাথে দেখা ও শোনা সম্ভব হয়। ফলে শিক্ষার্থীদের কাছে আরও বেশী কার্যকর হয়। দূরদর্শনের শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান যদি Compact Disc (C.D.)-তে ধরে রাখা যায় তবে ভবিষ্যতে পুনরায় ব্যবহার করা সম্ভব।

৬) **সক্রিয়তাভিত্তিক** - শিক্ষামূলক ভ্রমণ, প্রদর্শনী ও কোন ঐতিহাসিক ঘটনার নাট্য রূপান্তর ইত্যাদি সংগঠনে শিক্ষার্থীদের প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত করা হয়। শিক্ষামূলক ভ্রমণের মাধ্যমে বিদ্যালয়ের সাথে বৃহত্তর সমাজের যোগসূত্র স্থাপন সম্ভব হয়। শিক্ষার্থীরা যখন প্রদর্শনীর আয়োজন করে তখন তাদের সক্রিয়তা বৃদ্ধি পায় এবং জ্ঞান ও তথ্য সংগ্রহের সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়। প্রদর্শনীর দর্শকদের মধ্যেও জ্ঞানমূলক বিষয়ের প্রচার সম্ভব হয়। দর্শকদের সচেতনতা বৃদ্ধি পায়। অর্থাৎ প্রদর্শনীর মাধ্যমেও বিদ্যালয় ও সমাজের যোগসূত্র বৃদ্ধি পায়। ঐতিহাসিক ঘটনাভিত্তিক নাটক প্রদর্শনের দ্বারাও শিক্ষার্থীদের সক্রিয়তা বৃদ্ধি পায়।

৬.৩.৩ মূল্যায়ন (Evaluation) :

অত্যন্ত সতর্কতার সাথে কোন কিছুর মূল্য (value) অথবা পরিমাণ (amount) সম্পর্কে বিচার বিশ্লেষণের প্রক্রিয়াকে মূল্যায়ন বলা হয়। মূল্য বলতে শিক্ষার্থীর শিখনের মান এবং পরিমাণ বলতে শিক্ষার্থীর জ্ঞান ও দক্ষতার পরিমাপের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। বস্তুতপক্ষে, মূল্যায়ন এমন এক ধারাবাহিক প্রক্রিয়া যায় মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের বুদ্ধমার্গীয় পারদর্শিতা ও আচরণগত পরিবর্তনের পরিমাপ করা হয়। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের জ্ঞানমূলক বিকাশের জন্য বিবিধ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। পদক্ষেপ গ্রহণ করাই যথেষ্ট নয়; পদক্ষেপের বাস্তব ফলাফল জানা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে মূল্যায়নের ধারণা প্রয়োগ করা হয়। সুতরাং, মূল্যায়নের লক্ষ্য হল নির্দিষ্ট সময় অন্তর শিক্ষার্থীদের জ্ঞানমূলক বিকাশ ও পারদর্শিতার অগ্রগতির বস্তুনিষ্ঠ বিশ্লেষণ এবং ফলাফল ঘোষণা। মূল্যায়নের ভিত্তিতে শিক্ষার্থীদের সর্বাঙ্গীন বিকাশের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। শিক্ষার্থীদের জ্ঞানমূলক, বৌদ্ধিক, সামাজিক ও আচরণগত বিকাশ তাদের বয়েসের অনুপাতে সন্তোষজনক না হয় তবে পুনরায় তাদের বিকাশের জন্য কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়। সুতরাং মূল্যায়নের ধারণা অত্যন্ত ইতিবাচক এবং গতিশীল।

Shane এবং McSwan-এর চিন্তাধারা অনুসরণে বলা যায়, 'মূল্যায়ন এমন একটি প্রক্রিয়া

বা অনুসন্ধানের ব্যবস্থা যা সহযোগিতামূলক আলোচনার মাধ্যমে রচিত হয়, এবং এই ব্যবস্থার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের আচরণের পরিবর্তন এবং বিকাশের পর্যালোচনা, বিশ্লেষণ ও নির্দেশনা প্রদান করা হয়।' Chester T. McNernly-র অনুসরণে বলা যায়, 'যে কোন মূল্যায়ন কর্মসূচীর উদ্দেশ্যে হল যাদের পারদর্শিতার মানের বিচার বিশ্লেষণ করা হবে তাদের প্রয়োজনীয়তা খুঁজে বার করা এবং প্রয়োজন পূরণের জন্য শিখনের নতুন কর্মসূচী গ্রহণ করা।'

৬.৩.৪ মূল্যায়নের প্রকৃতি (Nature of Evaluation) :

১) শিক্ষণ-শিখনের সাথে মূল্যায়নের ধারণ ওতপ্রোতভাবে যুক্ত।

২) মূল্যায়ন ইতিবাচক, গঠনমূলক ও গতিশীল প্রক্রিয়া।

৩) মূল্যায়নের প্রক্রিয়ার দ্বারা সংশোধনমূলক কর্মসূচী গৃহীত হয়।

৪) মূল্যায়ন নির্দিষ্ট লক্ষ্য অভিমুখী। এজন্য ধারাবাহিকভাবে শিক্ষার্থীর পারদর্শিতা মূল্যায়ন করা হয়।

৫) মূল্যায়ন এক জটিল প্রক্রিয়া; শিক্ষার্থীর আচরণ ও তার বিকাশমূলক পরিবর্তন পরিমাপের জন্য ব্যবহৃত হয়।

৬.৩.৫ মূল্যায়নের লক্ষ্য ও প্রয়োজনীয়তা (Aims and Need of Evaluation) :

শিক্ষা কার্যক্রমের ফলাফল সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহের জন্য মূল্যায়ন প্রক্রিয়া গ্রহণ করা হয়। মূল্যায়ন প্রক্রিয়া ব্যতীত শিক্ষার্থীর পারদর্শিতার গুণগত ও পরিমাণগত মানের সামগ্রিক বিশ্লেষণ সম্ভব নয়। মূল্যায়ন যত বেশী বস্তুনিষ্ঠ হবে, শিক্ষা প্রক্রিয়াকে উন্নত করে। সুতরাং শিক্ষায় মূল্যায়নের ধারণা ব্যবহার বিভিন্ন কারণে অপরিহার্য;—

১) শিক্ষার্থীর দৈহিক, মানসিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ও প্রাক্ষোভিক বিকাশের উপর বর্তমানে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। মূল্যায়নের প্রক্রিয়া সুষ্ঠুভাবে অনুসরণ করতে পারলে এইসব বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ তথ্য সংগ্রহ সম্ভব হবে। প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে পুনরায় উন্নতমানের শিক্ষা কর্মসূচী গ্রহণের পরিকল্পনা করা সহজ হবে।

২) শিক্ষার লক্ষ্য, পাঠক্রম, পদ্ধতি, শিক্ষক-শিক্ষার্থী সম্পর্ক, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শৃঙ্খলা, শিক্ষার্থীদের শিখন অভিজ্ঞতা ইত্যাদি পরস্পরের সাথে সম্পর্কযুক্ত। শিক্ষার্থীদের আচরণের আকাঙ্খিত পরিবর্তন অভিমুখ সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহের মাধ্যমে ভবিষ্যৎ কর্মসূচী স্থির করা হয়।

৩) বৃত্তিমূলক নির্দেশনার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থী সম্পর্কিত যেসব তথ্য সংগ্রহ প্রয়োজন হয়, মূল্যায়নের মাধ্যমে সেইসব তথ্য লাভ করি।

৪) মূল্যায়নের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য 'কিউমুলেটিভ রেকর্ড কার্ড' প্রস্তুতে সাহায্য করে।

৫) একটি নির্দিষ্ট সময় অন্তর মূল্যায়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। এজন্য শিক্ষার্থীদের উন্নতির ধারাবাহিক চিত্র পাওয়া যায়।

৬) মূল্যায়নের প্রক্রিয়ার মাধ্যমে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষা পরিকাঠামো ও পরিবেশ সম্পর্কে সঠিক ধারণা পাওয়া যায়।

৭) মূল্যায়নের মাধ্যমে শিক্ষকদের দক্ষতার ও কর্মকুশলতার গুণগতমান সম্পর্কে ধারণা লাভের সম্ভাবনা থাকে।

৮) মূল্যায়নের ফলাফল প্রকাশের পর যেসব শিক্ষার্থীর পারদর্শিতার মান সন্তোষজনক তারা নিজেদের অগ্রগতির জন্য উৎসাহ লাভ করে।

৯) মূল্যায়নের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের দুর্বলতা ও অক্ষমতার বিশেষ বিশেষ দিকগুলি চিহ্নিত করা হয়।

১০) মূল্যায়নের ভিত্তিতে উচ্চশিক্ষার জন্য শিক্ষার্থীদের নির্বাচন করা হয়।

৬.৩.৬ মূল্যায়নের বৈশিষ্ট্য (Features of Evaluation) :

১) মূল্যায়ন একটি নিরবচ্ছিন্ন ও ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। শিক্ষার লক্ষ্য এবং শিখন অভিজ্ঞতার কার্যকারিতা বিশ্লেষণ করা মূল্যায়নের প্রাথমিক লক্ষ্য। বিশ্লেষণের মাধ্যমে যেসব ত্রুটি চিহ্নিত করা হবে, সেসব ত্রুটি সংশোধনের চেষ্টা করা হয়।

২) শিক্ষাবর্ষের শেষে বাৎসরিক পরীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের বৌদ্ধিক বিকাশের ও আচরণের গুণগত ও পরিমাণগত মান নিরূপণের পদ্ধতি বর্তমানে অচল। পরিবর্তে সমগ্র শিক্ষাবর্ষ ব্যাপী শিক্ষার্থীর বিভিন্ন কাজ ও আচরণের পরিবর্তনের উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখা হয় এবং তথ্য সংগ্রহ করা হয়।

৩) মূল্যায়ন একটি বহুমুখী প্রক্রিয়া। কারণ মূল্যায়নের মাধ্যমে শুধুমাত্র বৌদ্ধিক পারদর্শিতার বিচার বিশ্লেষণ করা হয় না; সামাজিক, সাংস্কৃতিক, প্রাক্ষোভিক, আধ্যাত্মিক, নৈতিক গুণাবলীর বিকাশের মান পরিমাপ করা হয়।

৪) মূল্যায়ন ব্যক্তিকেন্দ্রীয় প্রক্রিয়া। শিক্ষার্থীদের মধ্যে পারস্পরিক প্রতিযোগিতার বিশেষ গুরুত্ব নেই। শিক্ষার্থীরা নিজেদের উন্নতির জন্য সচেষ্ট থাকে। অন্য শিক্ষার্থীর অগ্রগতি ও অবনতির সাথে তাদের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক থাকে না।

৫) শিক্ষার সাথে সাথে শিক্ষার্থীর ভবিষ্যৎ কর্মজীবনের সম্ভাবনা সম্পর্কে মূল্যায়নে আলোকপাতের চেষ্টা করা হয়। এজন্য শিক্ষার্থীর পরিবার, পরিবেশ, অতীতের মূল্যায়নের তথ্য, বর্তমান কার্যকলাপ ও আচরণ পরিবর্তনের অভিমুখ ইত্যাদির ভিত্তিতে মূল্যায়ন পরিচালিত হয়।

৬) মূল্যায়ন প্রক্রিয়া একটি জটিল বিষয়। শিক্ষক, প্রধান শিক্ষক, মাতা-পিতা গ্রন্থাগারিক, ক্রীড়া শিক্ষক, কর্ম-শিক্ষা শিক্ষক প্রমুখ ব্যক্তির সাহায্য ও সহযোগিতা প্রয়োজন।

৭) সর্বোপরি, মূল্যায়নের জন্য সঠিক পদ্ধতি ও পদক্ষেপ প্রয়োজন। বিভিন্ন অভীক্ষা, পর্যবেক্ষন, সাক্ষাৎকার, আলোচনা, মৌখিক পরীক্ষা, বুদ্ধি অভীক্ষা, আগ্রহ অভীক্ষা ইত্যাদির ব্যবহার ও প্রয়োগের যথার্থতার উপর মূল্যায়নের সাফল্য নির্ভর করে।

৬.৩.৭ মূল্যায়নের কৌশল (Techniques of Evaluation) :

মূল্যায়নের কৌশলগুলিকে চার ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে —

(১) অভীক্ষা (Testing) (২) নিরীক্ষণ (Observation) (৩) স্বীয় মতামত প্রকাশ (Self Reporting) (৪) প্রতিফলন পদ্ধতি (Projective Techniques)।

৬.৩.৬.১ অভীক্ষা (Testing) :

গ্যারেট-এর ভাষায় অভীক্ষা হল এমন এক ধরনের কাজ যা কোন নির্দিষ্ট সময়ে ব্যক্তির কোন আচরণ পরিমাপের জন্য ব্যবহৃত হয়। অভীক্ষা পাঁচ ধরনের —

(ক) পারদর্শিতার অভীক্ষা - বিষয়ভিত্তিক জ্ঞানের মান পরীক্ষার জন্য এই অভীক্ষা পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। এই অভীক্ষা দু-ধরনের — (i) আদর্শায়িত অভীক্ষা যা পরিলক্ষিতভাবে পরিসংখ্যান শাস্ত্রের আলোকে ব্যাখ্যা করা হয়। এধরনের অভীক্ষার একটি আদর্শমান থাকে; এবং (ii) শিক্ষককৃত অভীক্ষা যা শিক্ষকদের দ্বারা পরিচালিত হয়। এধরনের অভীক্ষার আদর্শ মান নেই।

(খ) মনস্তাত্ত্বিক অভীক্ষা - এই অভীক্ষার দ্বারা মানসিক বৈশিষ্ট্যের পরিমাপ করা হয়। যেমন, বুদ্ধি অভীক্ষা, আগ্রহ অভীক্ষা ইত্যাদি।

(গ) লিখিত পরীক্ষা - নির্দিষ্ট একটি বিষয়ের ভিত্তিতে প্রশ্নপত্র তৈরী করা হয়। এ প্রশ্নপত্রের ভিত্তিতে শিক্ষার্থীদের লিখিত উত্তর পত্র জমা দিতে হয়।

(ঘ) মৌখিক পরীক্ষা - পাঠ্যবিষয় সম্পর্কে শিক্ষার্থীকে মৌখিক প্রশ্ন করা হয় এবং শিক্ষার্থী মৌখিক উত্তর দেয়।

(ঙ) দুর্বলতা নির্ণায়ক পরীক্ষা - এই অভীক্ষার মূল লক্ষ্য হল পাঠ্যবিষয়ের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের যদি কোন দুর্বলতা থাকে তবে সেসব দুর্বলতা পরিমাপের চেষ্টা করা।

৬.৩.৬.২ নিরীক্ষণ (Observation) :

শিক্ষার্থীকে নিরীক্ষণের মাধ্যমে তার সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। নিরীক্ষণের তিনটি কৌশল আছে—

(i) অতীত সংক্রান্ত তথ্য লিপি - শিক্ষার্থীর জীবনের অতীত ঘটনা মূল্যায়নের উপর প্রভাব বিস্তার করে। অতীত ঘটনার তথ্য বিশ্লেষণের মাধ্যমে ব্যক্তি প্রকৃতি সম্পর্কে তথ্য পাওয়া যায়। যেমন, কোন দুর্ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে কোন ছাত্র যদি দায়িত্বশীল পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে, তবে বলা যেতে পারে সংশ্লিষ্ট ছাত্রের কর্তব্যপরায়ণতার ও নেতৃত্ব প্রদানের ক্ষমতা আছে।

(ii) চেকলিস্ট - চেকলিস্টের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর শ্রেণীকক্ষের বিভিন্ন আচরণ লিপিবদ্ধ করা হয়।

(iii) রেটিংস্কেল - শিক্ষার্থীর কোন গুণ বা আচরণ সংক্রান্ত একটি সাধারণ মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে তিনটি বা পাঁচটি বিকল্প উত্তরের একটি তালিকা থাকে। এধরনের তালিকার যেকোন একটি উত্তরের ভিত্তিতে শিক্ষার্থীদের রেটিং নির্ণয় করা যায়। যেমন একটি ক্লাসে ৪০ জন শিক্ষার্থীর গণিত-এর দক্ষতার রেটিং নির্ণয়ের জন্য রেটিং স্কেলের পদ্ধতি গ্রহণ যেতে পারে। প্রত্যেক ছাত্রের নামের পাশে। (ধরা যাক) তিনটি উত্তর, যথা (ক) খুব ভাল (খ) সাধারণ (গ) সাধারণের থেকে কম, রাখা হল। এরপর একটি করে উত্তরের পাশে ✓ চিহ্ন দিতে বলা হয়। এভাবে রেটিং স্কেল মূল্যায়নের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়।

(iv) সমাজমিতি - জি. এল. মোরেনো (G. L. Moreno) এই পদ্ধতির আবিষ্কারক। এই পদ্ধতির মাধ্যমে সমাজের চোখে ব্যক্তির অবস্থান পরিমাপ করা হয়।

৬.৩.৬.৩ স্বীয় মতামত প্রকাশ (Self Reporting) :

শিক্ষার্থী যখন তার নিজের সম্পর্কে মতামত দেয় তখন তাকে self reporting বলে। স্বীয় মতামতের প্রতিফল বহুভাবে সম্ভব হতে পারে;—

(i) প্রশ্নাবলী - শিক্ষার্থীর মানসিকতা সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহের জন্য একাধিক প্রশ্নের তালিকা তাদের কাছে উপস্থাপন করা হয়। প্রশ্নের উত্তরের ভিত্তিতে শিক্ষার্থীর সামাজিক, প্রাক্ষোভিক, অনুরাগ ইত্যাদি সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা করা হয়।

(ii) সাক্ষাৎকার - সাক্ষাৎপ্রদানকারী এবং সাক্ষাৎপ্রার্থী উভয়ে মুখোমুখি বিভিন্ন কথাবার্তা বলেন। সাক্ষাৎপ্রার্থী বিভিন্ন প্রশ্নের মাধ্যমে সাক্ষাৎপ্রদানকারীর নিকট থেকে মূল্যায়নের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জানার চেষ্টা করেন।

(iii) ব্যক্তিগত দিনলিপি - শিক্ষার্থীদের দিনলিপি থেকে বহু ব্যক্তিগত তথ্য সংগ্রহ সম্ভব।

(iv) আত্মজীবনী - ব্যক্তির আত্মজীবনী তার সম্পর্কে মূল্যায়নে সাহায্য করে। আত্মজীবনীর বহু তথ্যের ভেতর থেকে সঠিক ও বস্তুনিষ্ঠ তথ্যগুলি চিনে নিতে হবে; নতুবা মূল্যায়ন ভুলপথে পরিচালিত হতে পারে।

৬.৩.৬.৪ প্রতিফলন পদ্ধতি (Projective Technique) :

এই পদ্ধতিতে অর্থহীন ছবি, অর্থপূর্ণ ছবি, অসম্পূর্ণ বাক্য অভীক্ষার্থীর সামনে উপস্থাপন করা হয়। প্রতিক্রিয়ার ভিত্তিতে তাঁর মানসিক, প্রাক্ষোভিক, সামাজিক প্রবণতা পরিমাপের চেষ্টা করা হয়।

৬.৪ সারাংশ (Summary) :

এই এককে শিক্ষাসহায়ক উপকরণ ও মূল্যায়নের সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। শিক্ষাসহায়ক উপকরণ দুই প্রকার — ১) প্রক্ষিপ্ত, ২) অপ্রক্ষিপ্ত। উভয় প্রকার উপকরণের বিভিন্ন এবং বিষয়গুলিকে শিক্ষণের কাজে ব্যবহারের কৌশলের বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

মূল্যায়নের পদ্ধতি ব্যতীত শিক্ষাব্যবস্থার তাৎপর্য বোঝা যায় না। সেজন্য শিক্ষকের পক্ষে মূল্যায়ন সম্পর্কে স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গী অনুসরণ করা দরকার। শিক্ষার্থীদের পারদর্শিতার মূল্যায়নের ক্ষেত্রে চারটি কৌশল অবলম্বন করা হয় — ১) অভীক্ষা, ২) নিরীক্ষণ, ৩) স্বীয় মতামত প্রকাশ, ৪) প্রতিফলন পদ্ধতি।

৬.৫ গ্রন্থপঞ্জী (Bibliography) :

১) Mazumder, Smritikana : Methods of Teaching Political Science.

২) Yadav, Nirmal : Teaching of civics and Political Science.

৩) Deshmukh, R.K. : Learn and Teach Political Science.

৪) Chopra, J.K. : Teaching of Political Science.

৫) Bhtia, K.K. : Teaching of Social Studies and Civics.

৬) Agarwal, J.C. : Teaching of Social Studies.

৭) ড. জয়ন্ত মেটে, ড. বিরাজলক্ষী ঘোষ, ড. রুমা দেব — শিক্ষক, নির্দেশনা ও মূল্যায়ন।

৮) ড. তুহিন কুমার কর, ড. ভীম চন্দ্র মণ্ডল — শিক্ষায় ব্যবস্থাপনা ও প্রযুক্তি বিদ্যা।

৯) কৌশিক চ্যাটার্জী — শিক্ষা প্রযুক্তি বিদ্যা।

১০) অধ্যাপক শ্যামপ্রসাদ চট্টরাজ — শিক্ষা প্রযুক্তি।

৬.৬ আত্ম সংশোধনমূলক প্রশ্ন (Self Check Question) :

১) শিক্ষাসহায়ক উপকরণের ধারণা ব্যাখ্যা করুন।

২) শিক্ষাসহায়ক উপকরণ ব্যবহারের তাৎপর্য বিশ্লেষণ করুন।

৩) উদাহরণ সহযোগে শিক্ষাসহায়ক উপকরণের শ্রেণীবিভাগ করুন।

৪) মূল্যায়নের অর্থ কী? মূল্যায়ণের বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা করুন।

৫) মূল্যায়নের ধারণা কীভাবে শিক্ষার উন্নতিতে সাহায্য করে? — ব্যাখ্যা করুন।

৬) মূল্যায়নের শ্রেণী বিভাগ করুন। অভীক্ষার ধারণা ব্যাখ্যা করুন।

৭) নিরীক্ষণমূলক কৌশল বলতে কী বোঝায়? আলোচনা করুন।

৮) মূল্যায়ন ও পরীক্ষার পার্থক্যগুলি আলোচনা করুন।

৯) মূল্যায়ন ও পরিমাপের পার্থক্যগুলি আলোচনা করুন।

১০) 'আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থায় মূল্যায়ন অপরিহার্য' — বিশ্লেষণ করুন।

UNIT – 7

পাঠ-পরিকল্পনা প্রস্তুত

(PREPARATION OF LESSON PLAN)

৭.১ উদ্দেশ্য (OBJECTIVE) :

শিক্ষকের অন্যতম দায়িত্ব হল পাঠ্যবিষয়ের সাথে শিক্ষার্থীদের সংযোগসাধন। সুতরাং শিক্ষক শ্রেণী-কক্ষে পাঠ্যবিষয় উপস্থাপনার জন্য বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করে। এক্ষেত্রে তাঁর মূল লক্ষ্য পাঠ্যবিষয় সহজ ও সরল ভাষায় শিক্ষার্থীদের কাছে বোধগম্য করা। স্বাভাবিকভাবেই শিক্ষণ-শিখন একটি পরিকল্পনাভিত্তিক কাজ। এই এককের মূল লক্ষ্য হল, উদ্দেশ্যমূলক পাঠ-পরিকল্পনা সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য উপস্থাপনা।

৭.২ সূচনা (INTRODUCTION) :

শ্রেণীকক্ষের পঠন-পাঠনের জন্য পাঠ-পরিকল্পনা গ্রহণ অপরিহার্য। ফ্রেডারিক হারবার্ট (১৭৭৬-১৮৪১) পাঠ পরিকল্পনা রচনার এক সামগ্রিক রূপরেখা উপস্থাপন করেন। পাঠ-পরিকল্পনার মাধ্যমে শিক্ষার্থীকে বিষয়বস্তুর সম্পর্কে সচেতন করা যায়। পাঠ-পরিকল্পনা রচনার মাধ্যমে শিক্ষকের মনে নিত্যনতুন উদ্ভাবনী শক্তির উন্মেষ হয়। এর ফলে শিক্ষার্থীরা উপকৃত হয়। পাঠ-পরিকল্পনা প্রয়োগের দ্বারা শিক্ষার্থীদের অগ্রগতি সম্পর্কিত feed back পাওয়া যায়।

৭.৩ পাঠ পরিকল্পনা প্রস্তুত (PREPARATION OF LESSON PLAN) :

শ্রেণীকক্ষের পঠন-পাঠনের ক্ষেত্রে পাঠ-পরিকল্পনার অতীব গুরুত্ব আছে। পরিকল্পনা ব্যতীত পাঠের সুষ্ঠু অগ্রগতি সম্ভব নয়। যদিও পাঠ-পরিকল্পনা কোন যান্ত্রিক পদ্ধতি নয়; পাঠ পরিকল্পনার সাথে সাথে শিক্ষকের নিজস্বতা এবং বৈচিত্র্যময় ভাষার দ্বারা বিশ্লেষণ প্রক্রিয়া শ্রেণীকক্ষের পঠন-পাঠনকে প্রাণবন্ত এবং হৃদয়গ্রাহী করে তোলে।

পাঠ-পরিকল্পনা হল শিক্ষণ-শিখনের মূল নক্শা। এই নক্শা অনুসারে শিক্ষক তার শিক্ষণের কাজ পরিচালনা করে। সুতরাং পাঠ-পরিকল্পনার মধ্যে শিক্ষণের লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য প্রতিফলিত হবে। পাঠ-পরিকল্পনার মধ্যে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি প্রতিফলিত হয় :

১) শিক্ষণ সম্পর্কে শিক্ষকের দর্শন,

২) বিষয়ের উপর বিভিন্ন তথ্য এবং সেইসব তথ্য উপস্থাপনার কৌশল,

৩) শিক্ষণের উদ্দেশ্য,

৪) শিক্ষণের বিষয়বস্তুর উপর শিক্ষকের জ্ঞান, এবং

৫) শিক্ষণের পদ্ধতি সম্পর্কেও তথ্য।

৭.৩.১ পাঠ-পরিকল্পনা রচনার পূর্ব শর্ত (Preconditions of Lesson Plan) :

পাঠ-পরিকল্পনার সময় শিক্ষকের অসতর্কতার জন্য শ্রেণীকক্ষের শিক্ষণ-শিখনের মূল উদ্দেশ্য ব্যহত হতে পারে। কয়েকটি বিষয়ে সতর্কতা গ্রহণ করতে পারলে পাঠ-পরিকল্পনা সর্বাঙ্গসুন্দর হবে; শ্রেণীকক্ষের শিক্ষণ-শিখনের প্রক্রিয়া গতিশীল এবং হৃদয়গ্রাহী হবে।

প্রথমতঃ, পাঠ্য-বিষয়ের উপর গভীর পড়াশুনা না থাকলে ভাল পাঠ-পরিকল্পনা রচনা সম্ভব নয়। সুতরাং শিক্ষকমহাশয় অবশ্যই পাঠ-পরিকল্পনা রচনার পূর্বে পাঠ্য Sentence incomplete.

দ্বিতীয়তঃ, শিক্ষা সহায়ক উপাদান ব্যতীত শ্রেণীকক্ষের শিক্ষণ-শিখন বিজ্ঞান সম্মতভাবে পরিচালনা সম্ভব নয়। সেজন্য, রাষ্ট্রবিজ্ঞানের যেকোন বিষয়ের পাঠ-পরিকল্পনার সময় শিক্ষা সহায়ক উপকরণের যথাযথ ব্যবহার পদ্ধতি সম্পর্কে সজাগ থাকতে হবে। শুধুমাত্র বক্তৃতা পদ্ধতি, আলোচনা পদ্ধতির প্রয়োগ যথেষ্ট নয়; মডেল, চার্ট, সময় তালিকা, ম্যাপ ইত্যাদি ব্যবহারের মাধ্যমে পাঠ-পরিকল্পনা নিখুঁত করতে হবে।

তৃতীয়তঃ, পরিবেশের সাথে শিখনের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ আছে। ফরাসী রাষ্ট্রবিজ্ঞানী জাঁ জ্যাক রুশোর Negative Education-এর ধারণা থেকে আমরা এবিষয়ে বিস্তারিত জানতে পারি। সুতরাং শ্রেণীকক্ষের শিক্ষণ-শিখনকে সর্বাঙ্গসুন্দর করার জন্য গ্রন্থাগার, পরীক্ষাগার, শিক্ষাব্যবস্থাপনার গভীর সম্পর্ক আছে। সবদিক বিচার বিবেচনার পর একটি ভাল পাঠ-পরিকল্পনা রচনা করা যায়।

৭.৩.২ সুবিধা (Advantage) :

১) পাঠ-পরিকল্পনা শিক্ষকের মনে আত্মবিশ্বাসের জন্ম দেয়। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ের প্রায়োগিক ও ব্যবহারিক গুরুত্ব আছে। এইসব বিষয় সম্পর্কে শিক্ষক যদি পূর্বেই প্রস্তুতি গ্রহণ করেন তবে শ্রেণী-শিক্ষণ সার্থক হবে।

২) ৪০ / ৪৫ মিনিটের একটি পিরিয়ডের জন্য একটি নিখুঁত পাঠ-পরিকল্পনা রচনা করা সম্ভব হলে, পিরিয়ড শেষ হবার পর শিক্ষার্থী সংশ্লিষ্ট বিষয়ের উপর সংহত ধারণা তৈরী করতে পারবে।

৩) পাঠ-পরিকল্পনার মাধ্যমে শিক্ষণ-শিখনের বিজ্ঞানসম্মত পরিবেশ রচনা করা যায়। কারণ পাঠ-পরিকল্পনা অনুসারে শিক্ষনের উদ্দেশ্য, শিক্ষণের পদ্ধতি, শিক্ষাসহায়ক উপরকরণ ইত্যাদি পিরিয়ড শুরু হবার পূর্বেই নির্দিষ্ট করা হয়। এর ফলে শ্রেণীকক্ষে সহজেই শিক্ষণের সুন্দর পরিবেশ সৃষ্টি হয়।

৪) পাঠ-পরিকল্পনার দ্বারা শিক্ষণ-শিখন ব্যবস্থাপনা গতিশীল হয়। শিক্ষক উপযুক্ত সময়ে, উপযুক্ত বিষয় এবং প্রয়োজনীয় উপকরণ ব্যবহার করতে পারেন। এইসব পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারলে শিক্ষণের প্রক্রিয়া মসৃণভাবে পরিচালিত করা যায়।

৫) রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ন্যায় জটিল ও গতিশীল বিষয়ে সুষ্ঠু পাঠ-পরিকল্পনার ফলে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর সময়ের অপচয় বোধ করা যায়। বিষয় সম্পর্কে বিস্তারিত জ্ঞান অর্জন ও তথ্য সংগ্রহ করবেন। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সাথে যেহেতু ইতিহাস, সমাজতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব, অর্থনীতি ইত্যাদির প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ যোগাযোগ আছে সেহেতু রাষ্ট্রবিজ্ঞানের শিক্ষককে এসব বিষয় সম্পর্কে প্রাথমিক জ্ঞান অর্জন করতে হবে।

৬) পাঠ-পরিকল্পনার সুষ্ঠু প্রয়োগ রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিষয়গুলিকে সহজভাবে ও বিজ্ঞানসম্মতভাবে শিক্ষার্থীদের কাছে উপস্থাপন করা যায়; অনুরূপভাবে পাঠ্যবিষয় সম্পর্কেও তাদের মধ্যে গভীর ভাবনা-চিন্তার উন্মেষ ঘটাতে পারে। প্রকৃতপক্ষে, শ্রেণীকক্ষে শিক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের আগ্রহ বৃদ্ধি ও তাদের শিক্ষার পথ প্রশস্ত করাই পাঠ-পরিকল্পনার মূল লক্ষ্য।

৭.৩.৩ ভাল পাঠ-পরিকল্পনার বৈশিষ্ট্য (Features of Good Lesson Plan) :

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের প্রতিটি বিষয়কে মনোগ্রাহী করে তোলার জন্য বিবিধ পদক্ষেপ গ্রহণ করা যায়। একথা মনে রাখতে হবে যে পাঠ-পরিকল্পনা যান্ত্রিক বিষয় নয়; এজন্য পাঠ-পরিকল্পনার বৈশিষ্ট গুলি অনমনীয় হতে পারে না। উপযুক্ত পরিস্থিতিতে শিক্ষকের দক্ষতার উপর পাঠ-পরিকল্পনার রচনা ও প্রয়োগ হয়। পাঠ-পরিকল্পনার সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলি হল নিম্নরূপ —

১) পাঠ-পরিকল্পনার নির্দিষ্ট লক্ষ্য থাকবে,

২) বর্তমান পাঠ-পরিকল্পনার সাথে বিগত পাঠ-পরিকল্পনার যোগসূত্র থাকবে,

৩) পাঠ-পরিকল্পনা লিখিত হবে,

৪) নির্দেশনার বিষয়বস্তু নির্বাচন ও শ্রেণীকক্ষে তার প্রয়োগের বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে,

৫) পাঠ-পরিকল্পনা বিভিন্ন একক এবং উপ এককে বিভক্ত হবে। কিন্তু প্রতিটি একক এবং উপ এককের মধ্যে সংহতি থাকবে,

৬) পাঠ-পরিকল্পনা এমনভাবে রচনা করতে হবে যাতে শিক্ষার্থীরা প্রত্যক্ষভাবে শিখনের প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করতে পারবে। কারণ আধুনিক শিক্ষা বিজ্ঞান শিক্ষার্থীদের সক্রিয়ভাবে শিক্ষণ-শিখনে অংশগ্রহণের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়,

৭) শ্রেণীকক্ষে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর বুদ্ধির স্তর, চাহিদা, আগ্রহ সমান হতে পারে না। এজন্য মনোবিজ্ঞানীরা 'ব্যক্তিগত বৈষম্য' ধারণা ব্যবহারের উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। সুতরাং পাঠ-পরিকল্পনার সময় শ্রেণী কক্ষের শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগত বৈষম্য সম্পর্কে শিক্ষককে সচেতন থাকতে হবে। অন্যভাবে বলা যায়, ব্যক্তিগত বৈষম্যের ধারণার প্রয়োগের সম্ভাবনাসম্পন্ন পাঠ-পরিকল্পনা রচনা করতে হবে,

৮) পাঠ-পরিকল্পনার মূল লক্ষ্যই হল শিক্ষার্থীদের কাছে পাঠের বিষয়বস্তু বিজ্ঞানসম্মতভাবে উপস্থাপন করা। সুতরাং এই উদ্দেশ্যসাধনের জন্য চার্ট, মডেল, সময় তালিকা, রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের ছবি, মানচিত্র ইত্যাদি শিক্ষা সহায়ক উপকরণ দক্ষতার সাথে ব্যবহার করতে হবে,

৯) পাঠ-পরিকল্পনার সাথে নমনীয়তার ধারণ ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্ক যুক্ত। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, গণতন্ত্র, নাগরিক অধিকার ও কর্তব্য রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তাত্ত্বিক স্তরে এগুলির আলোচনা পাঠ-পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত করা হয়। কিন্তু ভারতের সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবার কিছু দিন পর যদি এই বিষয়গুলি শিক্ষণ-শিখনের সময় শ্রেণীকক্ষে বাস্তব উদাহরণ প্রয়োগ করতে পারলে শিখনের পরিবেশ অত্যন্ত মনোগ্রাহী ও প্রাণবন্ত হতে পারে,

১০) পাঠ-পরিকল্পনার সাথে শিক্ষার্থীদের জন্য গৃহকাজ যুক্ত করা প্রয়োজন। গৃহকাজ অভ্যাসের মধ্যে দিয়ে তাদের পাঠ্যবিষয়ের অনুশীলন সম্ভব হয়। গৃহকাজ পরবর্তী অধ্যায়ে বার্ষিক পরীক্ষার প্রস্তুতিতে সাহায্য করে, এবং

১১) সর্বোপরি, শিক্ষকের মনের মধ্যে আত্ম-বিশ্লেষণের আগ্রহ থাকবে। আত্মবিশ্লেষণ করতে না পারলে শিক্ষকের নিজস্ব ভাবনা-চিন্তার বিকাশ ঘটবে না। শিক্ষকের বৌদ্ধিক জ্ঞানের ধারাবাহিক বিকাশ না হলে শিক্ষার্থীরা বঞ্চিত হবে।

৭.৩.৪ পাঠ-পরিকল্পনা রচনার হারবার্ট দৃষ্টিভঙ্গি (Herbart Approach to Lesson plan) :

জে. এফ. হারবার্ট (১৭৭৬-১৮৪১) পাঠ পরিকল্পনার রচনার এক যুগান্তকারী দৃষ্টিভঙ্গি আবিষ্কার করেন যা হারবার্ট দৃষ্টিভঙ্গি নামে পরিচিত। এই দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে একটি পূর্ণাঙ্গ ও বিজ্ঞানসম্মত পাঠ-পরিকল্পনার পাঁচটি স্তর আছে — আয়োজন, উপস্থাপন, অভিযোজন, সংযোগ এবং সূত্র নির্ধারণ বা সাধারণীকরণ।

আয়োজন — এই স্তরে পাঠ্যবিষয়ের প্রতি শিক্ষার্থীদের মনোযোগ আকর্ষণের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। শিক্ষার্থীদের মনে শিখনের আগ্রহ সঞ্চারের চেষ্টা করা শিক্ষকের অন্যতম দায়িত্ব। আগ্রহ সঞ্চার সম্ভব হলে পাঠ-পরিকল্পনা অনুযায়ী শ্রেণীকক্ষের শিক্ষণ-শিখন প্রক্রিয়া মসৃণভাবে পরিচালনা করা যায়। শিক্ষার্থীদের মনে আগ্রহ সঞ্চারের জন্য দু-ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে — ১) বিগত ক্লাসের বিষয়বস্তুর উপর প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মনে আজকের পাঠ্য-বিষয়ের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণের চেষ্টা করা হয়। ২) নতুন পাঠ্য বিষয়ের সাথে পরোক্ষভাবে সম্পর্কযুক্ত বিভিন্ন প্রশ্ন করতে করতে পাঠ্যবিষয়ের মধ্যে প্রবেশ করতে হবে। এই দ্বিতীয় ধরনের পদক্ষেপের সপক্ষে বলা হয় যে, শিক্ষার্থীরা সবসময় নতুন বিষয় জানতে আগ্রহী হয়। পূর্বপাঠের পুনরালোচনা অপেক্ষা নতুন প্রশ্ন তাদের মনে বাড়তি আগ্রহ ও উদ্দীপনা সৃষ্টি করে। প্রকৃতপক্ষে, আয়োজন স্তরের দক্ষ ব্যবহারের মাধ্যমে পাঠ ঘোষণার অনুকূল পরিবেশ তৈরী হয়।

উপস্থাপন — উপস্থাপনা হল পাঠ-পরিকল্পনার দ্বিতীয় স্তর। এই স্তরে শিক্ষক পাঠ্য বিষয়ের প্রকৃত আলোচনার সূত্রপাত করেন। আলোচনার সুবিধার জন্য সমগ্র পাঠ্যবিষয়কে একাধিক ছোট ছোট অংশে ভাগ করা হয়। প্রত্যেকটি অংশ উপস্থাপনার সময় নির্দেশনার গুরুত্ব অনুসারে শিক্ষাসহায়ক উপকরণ ব্যবহার করা হয়। উপস্থাপনার সময় নির্দেশনার গুরুত্ব অনুসারে শিক্ষাসহায়ক উপকরণ ব্যবহার করা হয়। উপস্থাপনার অংশটি দুটি ভাগে ভাগ করা হয়; প্রথম ভাগে বিষয়বস্তুর সংক্ষিপ্ত আলোচনা থাকে এবং দ্বিতীয় অংশে বিষয়বস্তুর আলোচনা এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য পদ্ধতির উল্লেখ থাকবে। উপস্থাপনার সময় প্রয়োজন মতো শিক্ষার্থীদের ছোট ছোট প্রশ্ন করা হয়। প্রশ্নগুলি উপস্থাপনার পদ্ধতি অংশে লেখা থাকে। সুতরাং বিষয় বস্তুর উপস্থাপন ও প্রশ্ন উত্থাপন — এই কৌশলের মাধ্যমে শিক্ষক সমগ্র পাঠ্যবিষয় শিক্ষার্থীদের কাছে বিশ্লেষণ করবেন।

অভিযোজন — অভিযোজনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের নবলব্ধ জ্ঞান পরীক্ষা করা হয়। শিখনের মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা অনুসারে বলা হয় যে, অর্জিত জ্ঞান যখন বাস্তবে প্রয়োগ ও কার্যকর করা হয়, জ্ঞানার্জন তখন সার্থক হয়। এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে জ্ঞান ধীরে ধীরে সংহত রূপ লাভ করে। শিক্ষার্থীদের জ্ঞানার্জন প্রক্রিয়া সার্থক হতে পারে যদি বিভিন্ন উপায়ে তাদের প্রশ্নোত্তর পর্বের সাথে যুক্ত করা হয়। প্রয়োজন অনুসারে বোর্ড ওয়ার্ক, চিত্র অঙ্কন, মানচিত্রে স্থান নিরুপণ ইত্যাদি পদ্ধতি গ্রহণ করা যেতে পারে। সর্বোপরি, শ্রেণী শিক্ষক তাঁর অভিজ্ঞতা ও উপস্থিত বুদ্ধির প্রয়োগের দ্বারা অভিযোজন স্তরের কাজ পরিচালনা করেন।

সংযোগ — হারবার্ট পদ্ধতি অনুসারে সংযোগ-এর অর্থ হল তুলনামূলক আলোচনা। শিক্ষার্থীরা যে জ্ঞান অর্জন করবে, সেই জ্ঞানের সাথে অন্য কোন বিষয়ের তুলনামূলক আলোচনার মাধ্যমে জ্ঞানার্জন সমৃদ্ধ হয়। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বহু বিষয়ের উদাহরণ সহযোগে এই তুলনামূলক আলোচনার মাধ্যমে সংহত জ্ঞানার্জনের ধারণা ব্যাখ্যা করা যায়; যেমন ভারতের গণতন্ত্রের কাঠামো ও ব্যবহারিক প্রয়োগ সম্পর্কে জ্ঞান লাভের পর, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে তুলনামূলক আলোচনা করা যেতে পারে। ভারতের সুপ্রীম কোর্টের বিচারবিভাগীয় সমীক্ষার ধারণা সম্পর্কে বিস্তারিত জ্ঞানার্জনের পর, মার্কিন সুপ্রীম কোর্টের বিচার বিভাগীয় সমীক্ষার ধারণার তুলনামূলক আলোচনা দ্বারা বিচার বিভাগীয় সমীক্ষার ধারণার বস্তুনিষ্ঠ জ্ঞানার্জন সম্ভব হবে।

সূত্র নির্ধারণ বা সাধারণীকরণ — রাষ্ট্রবিজ্ঞান হল সমাজবিজ্ঞানের গুরুত্বপূর্ণ শাখা। পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্রের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে প্রভূত পার্থক্য আছে। এজন্য রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিভিন্ন ধারণার পাঠ পরিকল্পনা রচনা, আলোচনা ও বিশ্লেষণের পর বিশ্বজনীনভাবে গ্রহণযোগ্য একটি সাধারণ সূত্র তৈরী করা যায় না। বিজ্ঞান বিষয় শাস্ত্রগুলির ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য একটি সাধারণ সূত্র নির্মাণ সম্ভব। যদিও এ ধরণের মন্তব্যেরও সীমাবদ্ধতা আছে। কিন্তু একথা সত্য যে বিজ্ঞান বিষয়ক শাস্ত্রের objectivity এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ন্যায় শাস্ত্রের objectivity সমপর্যায়ভুক্ত নয়। এজন্য গভীরভাবে বিস্তারিত আলোচনার পরে বিজ্ঞান বিষয়ক শাস্ত্রগুলির সাধারণ সূত্র নির্মাণ সম্ভব হলেও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সাধারণ সূত্র নির্ধারণ অত্যন্ত শক্ত। বিষয়ীগত (subjective) পরিপ্রেক্ষিত থেকে শর্ত সাপেক্ষ সাধারণ সূত্র নির্ণয় করা যেতে পারে। যেমন, মার্কিন সমাজে গণতন্ত্রের সাফল্যের যে সব শর্ত লক্ষ্য করা যায়, ভারতের সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থায় সেইসব শর্তের প্রত্যেকটি দেখা যায় না। যদিও ভারতের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে ব্যর্থ বলা যায় না। বিষয়গত এবং বিষয়গত পরিস্থিতির পার্থক্যের জন্য সাধারণীকরণের সমস্যা উদ্ভূত হয়। বৌদ্ধিক দৃষ্টিকোণ থেকে এধরণের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য হলেও, শিক্ষকের অন্যতম দায়িত্ব হল শিক্ষার্থীদের মধ্যে সাধারণ সূত্র নির্মাণের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে অবহিত করা।

গৃহকাজ — পাঠ পরিকল্পনার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হল গৃহকাজ। যে বিষয়ের উপর আলোচনা করা হয়। সেই বিষয়ের উপর বড় প্রশ্ন, ছোট প্রশ্ন এবং অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের উত্তর প্রস্তুত করার জন্য শিক্ষার্থীদের নির্দেশ প্রদান করা হয়।

৭.৩.৫ সুবিধা (Advantage) :

১) এই দৃষ্টিভঙ্গি শিক্ষার্থীদের শিখন অপেক্ষা শিক্ষকের শিক্ষনের উপর গুরুত্ব দিয়েছে।

২) সূত্র নির্ধারণ বা সাধারণীকরণ অত্যন্ত জটিল প্রক্রিয়া।

৩) হারবার্ট-এর দৃষ্টিভঙ্গি অত্যন্ত অনমনীয়, যান্ত্রিক এবং পূর্ব নির্ধারিত ছকে বাঁধা পথে পরিচালিত হয়। শ্রেণীকক্ষের শিক্ষন-শিখনে এ ধরনের যান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় পরিচালনা করা হলে শিক্ষকের আত্মতুষ্ঠি লাভ হতে পারে; কিন্তু প্রকৃত উদ্দেশ্য ব্যর্থ হবে।

পাঠ পরিকল্পনা শিক্ষককে সুষ্ঠুভাবে শিক্ষন-শিখনের প্রক্রিয়া পরিচালনা করতে সাহায্য করে। শ্রেণীকক্ষে সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় না।

১) পাঠ পরিকল্পনা অনুসারে শিক্ষন-শিখন পরিকল্পনা করতে পারলে, পাঠ্যবিষয়ের কোন অংশের পুনর্বার উল্লেখের সম্ভাবনা থাকে না; ফলে সময়ের অপচয় হয় না।

২) হারবার্টের দৃষ্টিভঙ্গির অনুসরণের দ্বারা শিক্ষকের আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পায়।

৭.৩.৬ হারবার্ট দৃষ্টিভঙ্গির সীমাবদ্ধতা (Limitations of Hebart Approach) :

বিশেষজ্ঞদের মতে হারবার্টের দৃষ্টিভঙ্গির বৌদ্ধিক মূল্য গুরুত্বপূর্ণ হলেও, এই দৃষ্টিভঙ্গির একাধিক সীমাবদ্ধতা আছে। যেমন;

১) এই দৃষ্টিভঙ্গি শিক্ষার্থীদের শিখন অপেক্ষা শিক্ষকের শিক্ষনের উপর গুরুত্ব দিয়েছে।

২) সূত্র নির্ধারণ বা সাধারণীকরণ অত্যন্ত জটিল প্রক্রিয়া।

৩) হারবার্ট-এর দৃষ্টিভঙ্গি অত্যন্ত অনমনীয় ও যান্ত্রিক যা পূর্ব নির্ধারিত ছকে বাঁধা পথে পরিচালিত হয়। শ্রেণীকক্ষের শিক্ষন-শিখনে এ ধরনের যান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় পরিচালনা করা হলে শিক্ষকের আত্মতুষ্টি লাভ হতে পারে; কিন্তু প্রকৃত উদ্দেশ্য ব্যর্থ হবে।

৭.৪ সারাংশ (SUMMARY) :

আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থায় শ্রেণী শিক্ষন সুষ্ঠুভাবে এবং বিজ্ঞানসম্মতভাবে পরিচালনার জন্য পাঠ পরিকল্পনা গ্রহণ অপরিহার্য। পাঠ পরিকল্পনা শিক্ষককে সময় ও শ্রমের সার্থক ব্যবহার সম্পর্কে সচেতন করে। পাঠ পরিকল্পনা রচনার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের জ্ঞানমূলক, বোধমূলক, প্রয়োগমূলক ও দক্ষতামূলক চিন্তাধারার বিকাশ দ্রুত হতে পারে। কারণ পাঠ পরিকল্পনা সাধারণত শিক্ষার্থীদের মনোবৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর রচনা করা হয়।

পাঠ পরিকল্পনার ক্ষেত্রে শিক্ষকদের ফ্রেডরিক হারবার্টের দৃষ্টিভঙ্গি অনুসরণের প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। এর পাঁচটি স্তর আছে — আয়োজন, উপস্থাপন, সমন্বয় সাধন, সাধারণীকরণ এবং প্রয়োগ। শিক্ষাবিদগণের মতে, পাঠ পরিকল্পনার এই ক্রম অনুসরণের দ্বারা পাঠ্য বিষয়কে শিক্ষার্থীদের কাছে মনোবিজ্ঞানসম্মতভাবে উপস্থাপন সম্ভব।

৭.৫ গ্রন্থপঞ্জী (BIBLIOGRAPHY) :

১) Mazumder, Smritikana : Methods of Teaching Political Science.

২) Yadav, Nirmal : Teaching of civies and Political Science.

৩) Deshmukh, R.K. : Learn and Teach Political Science.

৪) Chopra, J.K. : Teaching of Political Science.

৫) Bhatia, K.K. : Teaching of Social Studies and Civies.

৬) Agarwal, J.C. : Teaching of Social Studies.

৭) ডঃ জয়ন্ত মেটে, ডঃ বিরাজলক্ষ্মী ঘোষ ও ডঃ রুমা দেব — শিক্ষক, নির্দেশনা ও মূল্যায়ন; পৃঃ - ২৮৬-৩০১।

৭.৬ আত্ম সংশোধন প্রশ্ন (Self Check Question) :

১) পাঠ পরিকল্পনার অথ কী? পাঠ পরিকল্পনার উদ্দেশ্য ও প্রয়োজনীয়তা আলোচনা করুন।

২) একটি আদশ পাঠ পরিকল্পনার বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা করুন।

৩) পাঠ পরিকল্পনার সুবিধা ও অসুবিধাগুলি বিশ্লেষণ করুন।

৪) ফ্রেডরিক হারবার্ট-এর দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে পাঠ পরিকল্পনার পূর্ণাঙ্গ ধারণা ব্যাখ্যা করুন। এই দৃষ্টিভঙ্গির কি কোন সীমাবদ্ধতা আছে? — আলোচনা করুন।